শারদ সংখ্যা ১৪২০

জেলার খবর সমীক্ষা

সপ্তম বর্ষ

আশ্বিন ১৪২০ অক্টোবর ২০১৩

সূচীপত্র

সাক্ষাৎকার ঃ
গিনেস বুকে নাম ওঠা ও নোবেল কমিটির সদস্য হাওড়ার এক দরদী চিকিৎসক
ডাঃ সুকান্ত মুখোপাধ্যায় ৪
প্রবন্ধের আঙিনায় ঃ
ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও হাওড়া স্কুল
ডাঃ শঙ্করকুমার নাথ ৭
সহিত্য ও সংস্কৃতিতে কুকুর
ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় ১২
চৈতন্য সংস্কার ঃ গণচেতনার অভ্যুত্থান
ড. ঋতব্রত বসুমল্লিক ১৪
পুথিচর্চা ঃ
ডাক চরিত্র ঃ পুথি প্রসঙ্গ
শ্যামল বেরা ১৮
নিবন্ধের নিবন্ধন ঃ
পটল্যাচ
সুমহান বন্দ্যোপাধ্যায় ২২
একেই কি বলে শ্রীবৃদ্ধি
অলোককুমার মুখোপাধ্যায় ২৪
কুমারী পুজো
কাজল সেন ৪০
রোমন্থন ঃ
বেতার জগৎ — এক লুপ্ত সংস্কৃতি
প্রদীপকুমার ভট্টাচার্য ২৬
রানি রাসমণির বাড়ির দুর্গাপুজো
তাপস বাগ ২৯
আড্ডার একাল ও সেকাল
পল্টু ভট্টাচার্য ৩০
রোগনামচা ঃ
মহামারীর নাম ডিমেনসিয়া
ডা. গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায় ৩২
অঙ্কটঙ্ক ঃ
ধন্ধাঙ্ক
শাশ্বত দাস ৩৪
ছোটদের পাতা ঃ বিশেষ বিভাগ
গল্পের দরবার ঃ
তাম্রপত্র
জহর চট্টোপাধ্যায় ২০
শিক্ষা
প্রতিম চ্যাটার্জী ৩৫
প্রতিশোধ
অনির্বাণ মন্ডল ৩৬
একাকিনী
বাণীরূপা চক্রবর্তী ৩৭
ছন্দবাণী ঃ
আলোয় ভালোয় ভরাও ভুবন
ভবানীপ্রসাদ মজুমদার ৪০
নদীর এপার-ওপার
নিমাই মান্না ২৩
না চিনে
চন্দ্রাদিত্য চন্দ্র ২৫
এরই নাম পোস্ত
অমলেন্দু চট্টোপাধ্যায় ২৫
যুগের হাওয়া
মালতী দাস ৩১
বর মাগি
বিনয় শংকর চক্রবর্ত্তী ২৫
অহংকার
লিপিকা দাস ২৮
রিক্ততার অনুভব
কাকলি মুখার্জী ৩৩
বেঁচেই বাঁচা
প্রণব ভট্টাচার্য্য ৩৩
পিসা
শুভদীপ দত্তচৌধুরী ২৩
শিশু শিক্ষা
শ্রেয়শ্রী সিন্‌হা ৩১
বাতায়ন
শিল্পী অধিকারী ২৩
নিরপেক্ষ
প্রণব কুমার দাস ১৯

সম্পাদকীয়

বাজার গরম, আশেপাশের মানুষজনের মেজাজও গরম
খুনখারাপি, রাহাজানির চড়ছে পারদ, তবুও রোদ গরম গরম
ভোরের বেলা হিমেল হাওয়া, শরৎ মেঘের ক্ষণিক চাওয়া
ডাক এসেছে আশ্বিনেরই শিউলি থেকে — পুজো এসেছে
দ্বেষ কোলাহল সব ভুলে তাই দেদার খুশির হাট বসেছে
পুজো মানেই মায়ের আসা বাপের বাড়ি
পুজো মানেই চলো কোথাও দিই না পাড়ি
পুজো এলেই থিমের চমক, আলোর মালা, জনস্রোত
পুজো এলেই দেদার কেনা, দেদার খাওয়া, টাকার স্রোত
পুজোয় জমে আড্ডা ভালো, গানবাজনা পংক্তিভোজ
সঙ্গে নতুন বইয়ের মাঝে নতুন লেখার অবাক খোঁজ।
দিনকয়েকের জন্য যেন রোজনামচার রুটিন থেকে অবকাশ,
কিন্তু যারা পায় না খেতে, গ্রামের গরীব, ফুটপাথে বা
ঝুপড়িগুলোয় বসবাস
তারাও যেন হয় মা শামিল তোমার পুজোয় -
পুরাও তুমি তাদের আশ।

আমাদের সবচেয়ে বড় উৎসবের দিনে সকলের মন ভরে উঠুক আনন্দে। সামাজিক সম্প্রীতি ও ঐক্যের মেলবন্ধনে পুজো হোক সার্থক এই কামনা সহ পাঠক-পাঠিকা, গ্রাহক, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ী সবাইকে জানাই শারদ শুভেচ্ছা।

With Best Compliments From

Space Donated by

A
WELL
WISHER

শারদীয়ার শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন
কম খরচে কম্পিউটার শিক্ষার নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

রোটারি কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার ও ভোকেশনাল (টেলারিং) ট্রেনিং

সহযোগিতায় ঃ আই.সি.এ. ও রোটারি ক্লাব অফ সল্টলেক মেট্রোপলিটন
পরিচালনায় ঃ আর.সি.সি. ভাতেঘরী জনকল্যাণ সমিতি
ভাতেঘরী, জয়পুর, হাওড়া - ৭১১৪০১
মানস কুমার মাজী (৯৯৩২০০৭১৬১)

With Best Compliments From

A
WELL
WISHER

SAROJIT MANNA

গিনেস বুকে নাম ওঠা ও নোবেল কমিটির সদস্য হাওড়ার এক দরদী চিকিৎসক

ডাঃ সুকান্ত মুখোপাধ্যায়

তাঁর জন্ম ১৯৮৬ সালে মধ্য হাওড়ার সাঁত্রাগাছির সম্ভ্রান্ত ভট্টাচার্য্য বংশে যদিও সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্ম হয় নি তাঁর। বাবা চাকরি করতেন এক বেসরকারী কোম্পানীতে, রীতিমত কঠিন পরিশ্রম করে নানা প্রতিকূলতা কাটিয়ে বেড়ে ওঠা ডাঃ শুভেন্দু ভট্টাচার্য্য আজ শুধু হাওড়ার নন সারা ভারতের গর্ব কারণ তিনি সবচেয়ে কম বয়সে লন্ডনের রয়্যাল কলেজ অফ ফিজিসিয়ানস্ থেকে এম.আর.সি.পি. ডিগ্রী অর্জন করে গিনেস বুকে নিজের নাম তুলেছেন। এহ বাহ্য, তিনি একমাত্র ভারতীয় যিনি সুইডেনে অবস্থিত নোবেল পদক দেওয়ার জন্য চিকিৎসা ক্ষেত্রে যে সাব কমিটি আছে তার সদস্য। গোটা এশিয়াতে মাত্র দু'জন এই সম্মানের অধিকারী, এর অর্থ এশিয়া থেকে চিকিৎসাশাস্ত্রের এক বিশেষ শাখায় কারা নোবেল পুরস্কার পেতে পারেন সেই মনোনয়ন দিতে পারেন মাত্র এই দু'জন। নিরহঙ্কারী, সদালাপী, মানবদরদী এই চিকিৎসক একটি সংক্ষিপ্ত সাক্ষাতকারে জানিয়েছেন নানা কথা।

প্রশ্ন ঃ আপনার জন্ম কত সালে?

উত্তর ঃ হাওড়ায় ১৯৮৬ সালে?

প্রশ্ন ঃ পড়াশুনো কোথায় কোথায় করেছেন?

উত্তর ঃ প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয়েছিল 'বাণী ভারতী' নামে রিষড়ার একটি স্কুলে কারণ বাবা তখন চাকরি সূত্রে ওখানে থাকতেন। এরপর যখন হাওড়ায় এলেন তখন ভর্তি হই হাওড়া ময়দানের কাছে মারিয়াস ডে স্কুলে, সেখান থেকেই ২০০১ সালে আই.সি.এস.ই. ও ২০০৩ সালে আই.এস.সি পাশ করি এরপর জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়ে কলকাতার ন্যাশানাল মেডিকেল কলেজ। এম.বি.বি.এস. পাশ ২০০৮ সালে।

প্রশ্ন ঃ এম.ডি. না করে সরাসরি এম.আর.সি.পি. করার কারণ কি?

উত্তর ঃ দেখুন এম.ডি.তে চান্স পাওয়া শক্ত কারণ প্রতিযোগিতা অনেক বেশি। তাছাড়া ডাক্তারী পাশ করার পরই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম সরাসরি এম. আর.সি.পি. ডিগ্রীর জন্য চেষ্টা করব। জানতাম পরীক্ষা যথেষ্ট কঠিন সেজন্য প্রস্তুতিও নিয়েছিলাম ভালভাবে।

প্রশ্ন ঃ পরীক্ষা দিয়েছিলেন কোথায়?

উত্তর ঃ ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান এ'রকম কিছু দেশের জন্য অনলাইন পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট সময় বাঁধা থাকে আপনি উত্তর দিতে না পারলে প্রশ্ন আপনা থেকেই লক হয়ে যাবে। আর পরীক্ষায় প্রশ্ন হয় এম.সি.কিউ পদ্ধতিতে।

প্রশ্ন ঃ কিন্তু পড়ার খরচ তো অনেক?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, সেটা জানতাম বলেই কলকাতার ব্রিটিশ কাউন্সিলে স্কলার শিপের আবেদন করেছিলাম। পেয়েও গিয়েছিলাম। টাটা ফাউন্ডেশনের স্কলারশিপ থেকে ৫০ শতাংশ পড়ার খরচ পাওয়া গিয়েছিল।

প্রশ্ন ঃ বাকি খরচ?

উত্তর ঃ বাকি অর্ধেক খরচ লন্ডনে যাওয়ার পর কোর্সের ফাঁকে পার্ট টাইম চাকরি করে নিজেই জোগাড় করেছি। পেয়িং গেষ্ট হিসেবে একজনের বাড়িতে থাকতাম, তাতে থাকা খাওয়ার খরচ অনেক কম পড়ত।

প্রশ্ন ঃ লন্ডনে কোন কোন হাসপাতালে কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন?

উত্তর ঃ এম.আর.সি.পি. পড়ার সময় প্রথম ৮ মাস ওখানকার বিখ্যাত সেন্ট থমাস হাসপাতালে কাজ করেছি। ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল এই হাসপাতালেই কাজ করতেন, ওখানে তাঁর মূর্তি আছে, বিবেকানন্দের সঙ্গে ওখানেই তাঁর দেখা হয়। আর একটি ফলকে বিবেকানন্দের কিছু কথা লেখা আছে। এরপর চলে যাই লন্ডনের সরকারী রয়াল ফ্রি হাসপাতালে, কোর্সের বাকি সময়টা সেখানেই কাটিয়েছি।

প্রশ্ন ঃ এম.আর.সি.পি. কত দিনের কোর্স?

উত্তর ঃ দু'বছরের, তবে যারা একবারে পাশ করতে পারে না তাদের জন্য সাত বছর পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়।

প্রশ্ন ঃ ওখানে আপনার চিকিৎসার অভিজ্ঞতা কেমন?

উত্তর ঃ দেখুন দু'টো বিষয়ে ওদেশের ডাক্তারেরা ভীষণ কড়া। এক, এন্টিবায়োটিক আর দ্বিতীয় হল ব্যথা নিরোধক বা পেনকিলার। কোন রুগীকে এগুলো দিতে গেলে প্রথমেই আমার সিনিয়ারের অনুমতি দরকার সে যত কঠিন রুগীই হোক না কেন। সিনিয়ার আবার প্রয়োজন মনে করলে বিষয়টি মেডিকেল বোর্ডে পাঠাবেন। সেখান থেকে অনুমতি

এলে তবেই এই ওষুধ দেওয়া যাবে। আর একটা ব্যাপার কোন রুগীকে মেডিকেল বোর্ডের অনুমতি ছাড়া কোন অবস্থাতেই ভেন্টিলেশনে পাঠানো হয় না।

প্রশ্ন ঃ আপনি এম.বি.বি.এস. পড়ার সময় শিখে গিয়েছিলেন একরকম চিকিৎসা পদ্ধতি ওখানে গিয়ে দেখলেন অনেক জায়গায় তার সঙ্গে কোন মিল নেই। তাহলে এখন কিভাবে চিকিৎসা করছেন?

উত্তর ঃ ওখানে শেখা বিদ্যেটাই আমার ওপর প্রভাব ফেলেছে সবচেয়ে বেশি, এখন আমি চট করে এন্টিবায়োটিক বা পেনকিলার ব্যবহার করি না।

প্রশ্ন ঃ এম.আর.সি.পি. পড়ার সময় কার অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন সবচেয়ে বেশি?

উত্তর ঃ আমাদের পড়াতেন যাঁরা তাঁরা সকলেই দিকপাল চিকিৎসক তবে ওরই মধ্যে ডঃ শ্যুবার্ট-এর প্রভাব আমার মধ্যে সবচেয়ে বেশি পড়েছিল, আমি ওনার কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছি। বিশেষত ডাক্তারী ভাষায় যাকে বলা হয় 'ক্লিনিক্যাল আই' সেটি কিভাবে রপ্ত করতে হয় তা তিনি খুব যত্ন করে শিখিয়েছিলেন এছাড়া একজন বাঙালি ডাক্তার ছিলেন সেন্ট থমাস হাসপাতালে ডাঃ আশ, দীর্ঘদিন ও দেশে আছেন, ওখানকার গাইনি বিভাগের প্রধান তাঁর কাছেও অনেক কিছু শিখেছি।

প্রশ্ন ঃ দেশে ফিরলেন কবে?

উত্তর ঃ গিয়েছিলাম তো ২০০৯ সালের মার্চ মাসে, এপ্রিলে যে সেশন শুরু হয় তাতে ভর্তি হওয়ার জন্য। ওখানে দু'টো সেশন আছে একটা শুরু এপ্রিলে আরেকটা অক্টোবরে। তো আমি যেহেতু এপ্রিলে ভর্তি হয়েছিলাম তাই ২০১১ সালের এপ্রিলেই আমার কোর্স শেষ হয়ে যায়। পাশ করে ঐ মাসেই দেশে ফিরি। আর প্রাইভেট প্র্যাকটিশ শুরু করি ২০১১ সালের অক্টোবর মাস থেকে।

প্রশ্ন ঃ গিনেস বুকে নাম ওঠার ব্যপারটা কিভাবে হল?

উত্তর ঃ আমার বন্ধুরা অনেকটাই সাহায্য করেছে এজন্য। মূলত তাদেরই চাপে ২০১১ সালের শেষের দিকে আমি গিনেস কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করি। কারণ লন্ডনের রয়্যাল কলেজ থেকে যাঁরা এম.আর.সি.পি পাশ করেন তাঁদের নাম ও বয়স সম্বলিত ডাইরেক্টরি কলেজ কর্তৃপক্ষই প্রকাশ করে। সেখান থেকেই জানতে পারি যে আমিই সবচেয়ে কম বয়সে এই পরীক্ষা পাশ করেছি। গিনেস কর্তৃপক্ষকে সমস্ত কাগজপত্র পাঠাতে হয়। তারপর ওরা সত্যতা যাচাইয়ের জন্য কিছুটা সময় নেয়। ১৬ই এপ্রিল ২০১২ সালে ক্যুরিয়ার করে গিনেস কর্তৃপক্ষ আমাকে সার্টিফিকেট পাঠিয়ে দেন।

প্রশ্ন ঃ আর নোবেল কমিটির ব্যপারটা, এখানে মনোনীত হলেন কিভাবে?

উত্তর ঃ নোবেল পুরস্কার দেবার জন্য প্রার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে নানা বিষয়ে সাব কমিটি আছে। সুইডেনের ক্যারোলিনস্কা ইনস্টিটিউট-এ আছে মেডিসিন বিভাগের সাবকমিটি তাঁরাই প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকারী। তবে এর জন্য অনেক কাঠ খড় পোড়াতে হয়। ওরা প্রথমেই দেখবে আপনার কোন মৌলিক গবেষণাপত্র আছে কিনা। সৌভাগ্য বশত আমার পাঁচটা চিকিৎসা সংক্রান্ত পেপার এর মধ্যেই প্রকাশ হয়ে গিয়েছিল। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গেজেটে দু'টো, কেমব্রিজ নিউরোসাইন্সের জার্নালে একটা, হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলের গেজেটে দু'টো। ফলে আমার বাড়তি সুবিধা একটা ছিলই। ইন্টারনেটের মাধ্যমে ২০১২ সালের

গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস থেকে প্রাপ্ত সার্টিফিকেট

এপ্রিল মাস থেকে আমি ওদের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করি। ওখানেও সব কাগজ পত্র পাঠাতে হয়।

প্রশ্ন ঃ আপনাকে যে ওরা মনোনীত করেছে এই খবরটা পেলেন কবে?

উত্তর ঃ ২০১২ র নভেম্বরে মেল করে ক্যারোলিন্সকা ইনস্টিটিউট থেকে আমাকে জানানো হয় যে আমি মেডিসিন ও ফিজিওলজি বিভাগে মনোনীত হয়েছি।

প্রশ্ন ঃ শুনেছি এশিয়ায় মাত্র দু'জন এই সম্মান পেয়েছেন, এটা কি সত্যি?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, আমি ছাড়া আর একজন কোরীয়ান গবেষক একই বিভাগে মনোনীত হয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ তার মানে ভারতে আপাতত আপনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি নোবেল ফাউন্ডেশনের মেডিসিন সাব কমিটির সদস্য, এটাতো অত্যন্ত গর্বের বিষয়।

উত্তর ঃ হ্যাঁ তা বলতে পারেন।

প্রশ্ন ঃ নোবেল পুরস্কার কারা পাবেন তাঁদের মনোনয়ন করা হয় কিভাবে?

উত্তর ঃ দেখুন আমি তো শুধু চিকিৎসাশাস্ত্রের মেডিসিন ও ফিজিওলজি বিভাগের নির্বাচিত সদস্য। আপনি

From: Nobel Foundation
To: doctor_sb4@yahoo.com
Sent: Saturday, November 20, 2012 2:16 PM

Subject: Confirmation Nobel Foundation Membership

Membership Summary

Dear Dr. Bhattacharya,
We are glad to accept you as our Member of the Sub-Committee for "Medicine or Physiology" Selectors for the Asia Chapter. Heartiest Congratulations!!
Please check your personal details here under :
Dr. Subhendu Bhattacharya
Registration No. - 2977122
Name : Subhendu Bhattacharya
E-mail address : doctor_sb4@yahoo.com
Title : Dr.
Address : xxxMahendra Bhattacharya Road, Howrah., 711104 Kolkata
Country : India
Mobile : xxxxxx

Please indicate which best describes your status. :	Expert / Researcher
Personalised Medicine / Disease Genetics	5. Highly Interested
Genetically Modified Organisms / Genetics in the Environment	2. Less Interested
Genetic Determinism and the Regulation of Gene Expression	5. Highly Interested
Society's Role in Guiding the Development of Genetics and Genomics Research and Applications	4. More Interested
Synthetic Biology and Human Evolution	5. Highly Interested

ই-মেলে পাঠানো নোবেল কমিটির সদস্যপদের সম্মতিপত্র

জানেন নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয় অনেক কিছু বিচার বিবেচনা করে। বিশেষত মানুষের কল্যাণে কাজে লাগে এরকম গবেষণার জন্য। তো সারা পৃথিবীর নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বিভাগে কি ধরনের গবেষণা হচ্ছে সেই বিষয়ে খোঁজখবর রাখতে হয়। তবে একটা সুবিধা আছে যেহেতু ক্যারোলিন্সকা ইনস্টিটিউট সব বিশ্ববিদ্যালয়েই আমার নাম পাঠিয়ে দিয়েছে সেহেতু বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় নিজেরাই আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে। এতে কাজটা অনেক সহজ হয়ে যায়।

প্রশ্ন ঃ এম.আর.সি.পি. করার পর এখন কি পড়াশুনা করছেন?

উত্তর ঃ আমি এখন ম্যাসাচুসেট্স ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিতে নিউরোসাইন্সের উপর পি.এইচ.ডি. করছি।

প্রশ্ন ঃ আপনার বিষয়টা কি?

উত্তর ঃ ব্রেন কগনিশ্ন।

প্রশ্ন ঃ বিষয়টা একটু সহজে বলবেন?

উত্তর ঃ ধরুন আপনাকে একটা মশা কামড়ালো, আপনার একটা অনুভূতি হবে অর্থাৎ মস্তিষ্কে এর একটা খবর আদানপ্রদান হচ্ছে সেরকমই যাঁরা ডিমেনসিয়া বা অ্যালঝাইমার রোগে ভুগছেন সেই সব বয়স্ক মানুষদের ক্ষেত্রে ঐ সংবেদনটা কি একই রকমের হবে নাকি কিছুটা তফাৎ হবে? খুব সহজে বলতে গেলে এই তফাৎ খুঁজে বার করা সেই সঙ্গে তা সারানো যায় কিভাবে এটাই আমার গবেষণার বিষয়।

প্রশ্ন ঃ ভবিষ্যতে কি দেশেই থাকবেন?

উত্তর ঃ হ্যাঁ অবশ্যই, বিদেশে থাকার কোন বাসনা আমার নেই।

প্রশ্ন ঃ শুনেছি আপনি গরীব রুগীদের কাছ থেকে কোন পয়সা নেন না।

উত্তর ঃ হ্যাঁ যতটা পারি চেষ্টা করি কিছুটা সাহায্য করার। কলকাতার শ্যামপুকুরে 'পল্লীমঙ্গল সমিতি' বলে একটা প্রতিষ্ঠান আছে, আমাদের প্রাক্তন রাজ্যপাল শ্যামল সেন এর সঙ্গে যুক্ত। এখানে মাসে দু'দিন আমি বিনা পারিশ্রমিকে রুগী দেখি।

প্রশ্ন ঃ হাওড়া থেকে এরকম কোন প্রস্তাব পান নি?

উত্তর ঃ এখনও পাইনি, পেলে ভেবে দেখব।

প্রশ্ন ঃ আপনার জীবনে সবচেয়ে বেশি অনুপ্রেরণা কার কাছ থেকে পেয়েছেন?

উত্তর ঃ আমার বাবা মা আর ডাক্তারী বিষয়ে আমার আদর্শ ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়।

প্রশ্ন ঃ ডাক্তারী ছাড়া সাহিত্য বা অন্যান্য বিষয়ের চর্চা করার সময় পান?

উত্তর ঃ হ্যাঁ আমি কবিতা ভীষণ ভালোবাসি, মাঝে মাঝে লিখিও। স্কুলে থাকাকালীন নাটক লিখতাম, অভিনয়ও করতাম। এখন আমি হাওড়া মেডিকেল ক্লাবের জয়েন্ট সেক্রেটারি। ওখানে যখন নাটক হয় তখন তাতে অভিনয় করি। বলতে পারেন অভিনয় করাটা আমার একটা নেশা। সময় পেলে ভালো নাটক দেখতেও যাই।

প্রশ্ন ঃ শেষ একটা প্রশ্ন আপনার প্রিয় সাহিত্যিক কে?

উত্তর ঃ সুকুমার রায়।

ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও হাওড়া স্কুল

ডাঃ শঙ্করকুমার নাথ

১৮৪৫ সাল। শিক্ষাজগতের ইতিহাসে হাওড়াতে একটা নতুন মাইলফলক যুক্ত হল। সেখানে প্রতিষ্ঠিত হল প্রথম সরকারি ইংরেজি স্কুল। নাম হল ''হাওড়া স্কুল''। কয়েকবছর ধরেই হাওড়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মানুষ এমনই একটি স্কুলের জন্য মৌখিক দাবি জানিয়ে আসছিলেন। শেষে প্রায় দু'শোজন হিন্দু পিতামাতার দরখাস্তের জেরে ঐ বছরই স্থাপিত হল হাওড়া স্কুল। স্কুল ভবন তৈরির জন্য স্থানীয় শুভাকাঙ্খীদের কাছ থেকে চাঁদা হিসেবে পাওয়া গেল প্রায় চার হাজার টাকা। ইংরেজ সরকার হাওড়ার ময়দানের সল্ট অফিসের পূর্বদিকে আড়াই বিঘের মত জমি মঞ্জুর করলো স্কুল বাড়ি নির্মাণের জন্য। শুরুতে একজন ম্যাজিস্ট্রেটকে সভাপতি করে একটি ''স্থানীয় কমিটি'' তৈরি করা হল। এই কমিটিই স্কুলটি পরিচালনা শুরু করলো। (১)

১৮৪৫-৪৬ সালের শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে স্কুলের প্রথম বছরের চেহারাটা কেমন ছিল দেখা যাক ঃ

"HOWRAH SCHOOL, First Year,
G. F. Cockburn, Esq., C. S. Magistrate.
Dr. W. A. Green, Civil Surgeon.
Dr. E. Roer, Assistant, Salt Golahs.
Baboo Hurrochunder Chowdry.
Baboo Rajcoomar Banurjee, Establishment.
Mr. J. F. Delanougerede, Head Master.
Baboo Bhogobotychurn Ghose, 2d Ditto.
Baboo Bholanauth Ghose, 3d Ditto.
On the 16th November, the Magistrate reported that he had received 190 applications for admission, and recommended that the school should be opened at once with a sufficient establishment of masters. A house was engaged for the temporary accomodation of the school, at a rent of rupees 60 a month, untill a suitable school house should be erected, for which purpose the sum of rupees 3800 was subscribed before the close of the year. On the 7th January, a local committee was appointed to assist the Magistrate in superintending the affairs of the school." (২)

অর্থাৎ ১৬ নভেম্বর ম্যাজিস্ট্রেট জানালেন, স্কুলে ভর্তির জন্য ১৯০ জনের দরখাস্ত জমা পড়েছে। সুতরাং যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষক সংগ্রহ করে স্কুল শুরু করে দেওয়া উচিত। মাসিক ৬০ টাকা ভাড়ায় অস্থায়ীভাবে একটি বাড়ি ভাড়া নেওয়া হল স্কুলের জন্য যতদিন না স্কুলের নিজস্ব বাড়ি গড়ে ওঠে। এই উদ্দেশ্যে বছর শেষের আগেই ৩৮০০ টাকা সংগৃহীত হয়ে গেল। পরিচালনের জন্য একজন ম্যাজিস্ট্রেটকে শীর্ষে রেখে জানুয়ারির ৭ তারিখে একটি ''স্থানীয় কমিটি'' গঠন করা হল।

দ্বিতীয় বছরে ১৮৪৬-৪৭ সালে দেখতে পাচ্ছি ককর্বান-এর জায়গায় এলেন ম্যাজিস্ট্রেট ই. জেনকিন্‌স্। এলেন সল্টগোলা-র সুপারিনটেন্ডেন্ট এইচ. আলেকজান্ডার। কমিটিতে আরো এলেন জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। এ-বছর চতুর্থ শিক্ষক হিসেবে আরো একজন এলেন, তাঁর নাম শ্রীনাথ দত্ত। পরে আরো একজন শিক্ষকমশাইকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।

কমিশনের রিপোর্ট বলছে — "The Committee's report on the annual examination of this schoo, shews that very satisfactory progress has been made by all the classes."

মে মাসে ছাত্র সংখ্যা ছিল ২১৫, গড়পড়তা উপস্থিতি ছিল ১৭০ জনের মত। তিন জন শিক্ষকের পক্ষে এই ছাত্রসংখ্যা একটু বেশিই ছিল, তাই আরো দু'জন শিক্ষককে নিযুক্ত করা হয়েছিল।

এই সময় কমিটিকে এমন অনুরোধও করা হয়েছিল, স্কুলে যেন ২০০-র বেশি ছাত্র ভর্তি না করা হয়। এমন কি প্রতি ছাত্রের কাছ থেকে ভবিষ্যতে স্কুল ফি হিসেবে এক টাকা করে অতিরিক্ত ধার্য করার প্রস্তাবও উঠেছিল।

হাওড়া স্কুলের নতুন ভবনের জন্য মিলিটারী বোর্ডকে গত বছরের (১৮৪৬ সাল) সেপ্টেম্বরেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে স্কুল বাড়ির জন্য একটি পরিকল্পনা এবং খরচের হিসেব পেশ করতে। কিন্তু বোর্ড এ বছর (১৮৪৭) মার্চ মাস পর্যন্ত তা করতে না পারায় স্কুল কমিটির সদস্যরাই একটি পেশাদার বাড়ি নির্মাণ সংস্থা ''মেসার্স কার্টার এন্ড কোং''-কে নিয়োগ করে দিলেন। বাড়ি তৈরির খরচ ধরা হল ৫৮৭৫ টাকা ১০ আনা। (৩)

১৮৪৭-৪৮ সালে তৃতীয় বছরে এলো অশনি সংকেত। কমিশনের রিপোর্টে বলা হল, ১৮৪৭ সালের শেষে দেখা যাচ্ছে ছাত্র সংখ্যা ১১৩ জনে নেমে এসেছে। এর কারণ হিসেবে বলা হয়েছে যে, সরকার নির্দেশিত প্রতি ছাত্র পিছু ১টাকা করে অতিরিক্ত স্কুল ফি ধার্য করার জন্যই এমনটা হল। যদিও রিপোর্টের শেষে লেখা হল, "Satisfactory progress has however been made by several of the classes, and the Institution will henceforth be placed under the superintendence of the Inspector."(৪)

এখনকার হাওড়া জেলা স্কুল

চতুর্থ বছরে হাওড়া স্কুলে ভগবতীচরণ ঘোষের জায়গায় দ্বিতীয় শিক্ষক হিসেবে যোগ দিলেন কানাইলাল বসাক। কমিটিতে নতুন এলেন ডাঃ এ. সি. ম্যাক্‌ক্রি। ১৮৪৮-৪৯ সালের রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে তখনও পর্যন্ত প্রধান শিক্ষক রয়েছেন জে.এফ.ডেলানুগেরেডে। আর আগের বছর যে প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল, সেই অনুযায়ী ১৮৪৮ সালের জুন, জুলাই, আগষ্ট, নভেম্বর এবং ডিসেম্বরে বারবার স্কুলে পরিদর্শক এসেছেন আকস্মিকভাবে, তদারকি করেছেন। এইসময় একজন পরিদর্শকের বক্তব্য কী ছিল, আমরা তাঁর মুখ থেকে তা শুনি ঃ

"The frequent unexpected visits I gave to this school afforded me every opportunity for observing the general manner in which it was conducted and the regularity and attendance of the masters and students, and it gives me much pleasure to be able to report very favorably upon all I saw. Though many of the days were amongst the most rainy of the season, the attendance was good and punctual and upon one occasion only, when the state of the weather was a suficient excuse, did I observe two of the masters come rather late."

এরপর ছাত্রদের কথা বলতে গিয়ে আরো বলেছেন,

"The dress and appearance of the students were always clean and satisfactory; their behaviour in the class rooms till the close of the day, was correct and orderly, whilst with the diligence and manner of the masters, I found nothing to object."[৫]

হাওড়া স্কুলের সুনাম এবং সম্মান বৃদ্ধি করতে এই সময় থেকেই হিন্দু কলেজের অধ্যাপকদের এনে স্কুলের ছাত্রদের পরীক্ষা নেবার ব্যবস্থা করা শুরু হল। ঐ বছর জুনিয়র স্কলারশিপের জন্য হাওড়া স্কুলের পাঁচজন উচ্চ শ্রেণির ছাত্রদের পরীক্ষা করেন হিন্দু কলেজের অধ্যাপকগণ। পরীক্ষা করে অধ্যাপকরা বলে গেলেন এই পাঁচজনের কারোরই জুনিয়র স্কলারশিপ পাওয়া উচিত নয়। কেননা এরা সকলেই প্রধানত পাটিগণিত, ইতিহাস এবং ইংরেজিতে ফেল করে গেছে। মোটামুটি ভাল ফল করেছে ইউক্লিড এবং ভূগোলে। পরিদর্শক অবশ্য এদের পিছিয়ে পড়ার একটা ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং öẪøËÊ ÂöÂù ßÂÊþ ÛýÕ±ú±Ý › ¶ÂÊù ßÂÊþò ÛýõÊù, "(They are) not backward in expressing their ideas with tolerable correctness in writing, so that considering how short a time it is since the establishment of the school, their not obtaoning scholarship should occasion no surprise, and they may be considered to have made on the whole satisfactory progress." [৬]

এই বছরই মিঃ আলেকজান্ডার হাওড়া স্কুলের সবচেয়ে ভাল দু'জন ছাত্রের জন্য দুটি পুরস্কার দেবার ব্যবস্থা করেন। [৭]

হাওড়া স্কুলের পঞ্চম বছরে অর্থাৎ ১৮৪৯ সালে স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগ দিলেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়। এ বছর স্কুলের স্থানীয় কমিটিতে নতুন এলেন এইচ. প্রাট সাহেব সচিব হিসেবে, শিক্ষক সেই চারজনই, প্রধান শিক্ষক ভূদেব মুখোপাধ্যায়, আর বাকিরা হলেন দ্বিতীয় শিক্ষক চুনীলাল বসাক, তৃতীয় শিক্ষক প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় এবং পঞ্চম শিক্ষক শ্রীনাথ দত্ত। চতুর্থ শিক্ষক ছিলেন না।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়

ভূদেব মুখোপাধ্যায় যখন যোগ দিচ্ছেন, ঠিক তখন স্কুলের অবস্থাটা একটু দেখে নেওয়া যাক। ১৮৪৯ সালের জুলাই থেকে ডিসেম্বর এই ছ'মাসের রিপোর্টে বলা হয়েছে, মোট পাঁচটি শ্রেণি ঃ প্রথম শ্রেণিতে (এখনকার মত প্রথম শ্রেণি নয়। প্রথম শ্রেণির অর্থ ছিল সর্বোচ্চ শ্রেণি) ছিল ৫জন ছাত্র; দ্বিতীয় শ্রেণিতে (প্রথম শ্রেণির নীচে) ছিল ১৬ জন; তৃতীয় শ্রেণিতেও ১৬ জন; চতুর্থ শ্রেণিতে ২০ জন; পঞ্চম শ্রেণির (সর্বনিম্ন শ্রেণি) প্রথম বিভাগে ছিল ৩৫ জন এবং ওরই দ্বিতীয় বিভাগে ছিল ১৪ জন; মোট ছাত্র সংখ্যা স্কুলে ১০৬ জন। [৮]

হাওড়া স্কুলে ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন ২৩ আগস্ট, ১৮৪৯ সালে।

আর ঐ বছর সাধারণ বাৎসরিক পরীক্ষা হয়েছিল সেপ্টেম্বরে।

হাওড়া স্কুল থেকে এই প্রথম পরীক্ষার পর প্রথম শ্রেণির পাঁচজন ছাত্র কলকাতার হিন্দু কলেজে চলে গেলেন ৫ ডিসেম্বর একেবারে স্কলারশিপসহ। এই পাঁচজন হলেন হেরম্বচরণ চৌধুরী, সূর্যকুমার সেন, ব্রজমোহন লাহিড়ী, রাজকুমার রায় এবং অভয়চরণ মুখোপাধ্যায়।[৯]

পরীক্ষক ছিলেন আলেকজান্ডার, প্র্যাট এবং রোয়ার সাহেব। অন্যান্য শ্রেণির পরীক্ষা সম্পর্কে এদের মতামত ছিল সন্তোষজনক। পরিদর্শক এই পরীক্ষা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে লিখছেন,

"In Bengali they were far behind the scholars of the Ootterparah School, where a pundit is appointed. This confirms my opinion, which I had the honor to express before, that most of the native masters are unable to teach Bengali. In fact they have a more competent knowledge of the English than of their own language, of which they neither know the grammar, nor the exact meaning of the words." [১০]

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের জন্ম কলকাতায় ৩৭ নম্বর হরিতকীবাগান লেনের বাড়িতে ১৮২৫ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি (মতান্তরে ১৮২৭ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি)। প্রথমে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন। পরে স্কুল পরিবর্তন করে আরও দুটি বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেছেন। শেষে ১৮৩৯ সালে ভর্তি হলেন হিন্দু কলেজে। এই কলেজেই তিনি সহপাঠি হিসেবে পেয়েছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্তকে। ১৮৪৫ সালে হিন্দু কলেজের পড়াশুনা শেষ করলেন তিনি।[১১]

জীবনীকার লোকনাথ ঘোষ একজায়গায় ভূদেব মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে লিখছেন, "After leaving the college, he established some private schools, at Siakola, Chandernagore, Sripur and other places for the good of his country men, but for want of funds he had to give up his exertions and to commence his service as a second English teacher in the Calcutta Madrasa on a salary of Rs. 50, per mensem. After he has served here for ten months he was appointed Head Master of the Howrah Government School."[১২]

ভূদেব মুখোপাধ্যায় কলকাতা মাদ্রাসায় ইংরেজির দ্বিতীয় শিক্ষক হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন ১৮৪৮ সালের ২০ ডিসেম্বর।

এবার দেখি হাওড়া স্কুলের ষষ্ঠ বছরের (১ অক্টোবর ১৮৪৯ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর ১৮৫০ সাল পর্যন্ত) বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে কি লেখা হয়েছিল। এই বছর স্থানীয় কমিটি একই রয়েছে। শিক্ষকদের মধ্যে প্রধানশিক্ষকরূপে যোগ দিলেন ভূদেব মুখোপাধ্যায় ২৩ আগষ্ট ১৮৪৯ তারিখে মাসিক ১৫০ টাকা বেতনে। দ্বিতীয় শিক্ষক কানাইলাল বসাক, পেতেন ৫০ টাকা, প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় পেতেন ৩০ টাকা, শ্রীনাথ দত্ত ২০ টাকা এবং নতুন এসেছিলেন অস্থায়ী বদলি হিসেবে দ্বিতীয় শিক্ষক মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, তাঁর মাসিক বেতন ছিল ২৫ টাকা।[১৩]

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের দক্ষতা আর প্রতিভায় হাওড়া স্কুল ক্রমশ উন্নতি করতে লাগলো, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ঐ বছরের শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে একস্থানে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের প্রধান শিক্ষকতা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে স্কুল পরিদর্শক লিখছেন, "I cannot conclude this portion of my report without bearing my testimony to the worth and ability of the head master, Bhoodeb Mookerjea. From the proximity of the Howrah School to the place of my daily avocations, I have had frequent opportunities of being present during class hours, and my belief that it would be impossible to find any one more fitted both in temper and ability to conduct the important duties which are entrusted to him. I rejoice to say that the Native community share with me is the confidence which I have expressed."[১৪]

এই সময়টাতে বাংলার "কাউন্সিল অফ এডুকেশন"-এর সভাপতি ছিলেন বেথুন সাহেব। অন্যান্য সদস্যরা ছিলেন, কলভিল, হ্যালিডে, ইলিয়ট, বিডন, গ্র্যান্ট, ফরসাইথ, রসময় দত্ত, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ এবং মোয়াট সাহেব।[১৫]

এই বছরের জুনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষায় ছ'জন ছাত্র প্রার্থী ছিলেন হাওড়া স্কুলে। তাঁদের পরীক্ষার ফলাফল নীচে দিলাম। মোট নম্বর (ফুল মার্কস) ছিল ৩০০।

		কত মার্কস পেয়েছেন						
	প্রার্থীর নাম	ইতিহাস	ভূগোল	গ্রামার	অংক	ইংরেজি থেকে অনুবাদ	রিডিং	মোট
১	দীননাথ মুখোপাধ্যায়	২৬.২৫	২৮	২৫	১৪.২৫	২৮	৩২.৭৫	১৫৪.২৫
২	দ্বারকানাথ চক্রবর্তী	২৫	২১	২৭	১৯.৭৫	২০	৪০	১৫২.৭৫
৩	গোপালচন্দ্র মল্লিক	১৭	২৮.৫	১৬	১৯.৭৫	২৪	২৬.৫	১৩১.৭৫
৪	দীনবন্ধু দত্ত	১৩.৫	১৫.৫	২০	২৪.৫	১৫	৩৩	১২১.৫
৫	প্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায়	১২.২৫	১০.৫	১৪	১১.৫	১৮	২৫.৫	৯১.৭৫
৬	রামচন্দ্র রায়চৌধুরী	৮.৭৫	১৫	১৩	৮.৭৫	১৯	২০.২৫	৮৩.৭৫

নীচে স্বাক্ষর করেছেন সম্পাদক ডাঃ মোয়াট।[১৬]

সপ্তম বছরে (১৮৫০-১৮৫১ সাল) হাওড়া স্কুলের কমিটি থেকে চলে যান প্র্যাট সাহেব। শিক্ষকদের মধ্য থেকে কানাইলাল বসাক স্বাস্থ্যের

কারণে লম্বা ছুটি নিয়ে চলে যান। মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় অন্যত্র চলে যান। নতুন যোগদান করেন চতুর্থ শিক্ষক হিসেবে মাসিক ২০ টাকা বেতনে যদুনাথ আঢ্য ১৮৫১ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি।

এই বছর স্কুলের ফি বৃদ্ধি করা হয় ১২২ টাকা ৫ আনা থেকে ১৪০ টাকাতে। এই সময় প্রধান শিক্ষক ভূদেব মুখোপাধ্যায় নিজে পরীক্ষক হিসেবে চতুর্থ শ্রেণির পরীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। (১৭)

অষ্টম বছরে (১৮৫১-৫২) কমিটিতে কোন পরিবর্তন হয়নি। বরং শিক্ষকদের মধ্যে কেবলমাত্র প্যারীমোহন মুখার্জির জায়গায় দ্বিতীয় শিক্ষক হয়ে আসেন নবীনচন্দ্র বসু মাসিক ৫০ টাকা বেতনে। তিনি যোগ দেন ১৮৫১ সালের ১ ডিসেম্বর।

এ বছর আবার স্কুল ফি-এর বৃদ্ধি ঘটে ১৪০ টাকা থেকে ১৭৫ টাকায়। প্রথম শ্রেণির দ্বিতীয় বিভাগে ছিলেন ১৪জন ছাত্র। পরীক্ষার দিন উপস্থিত ছিলেন ১১ জন। প্রশংসাপত্র পেয়েছেন মাত্র তিনজন। এঁরা হলেন ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য, আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। এমন খারাপ ফল কেন হল তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে পরিদর্শক মহাশয় রিপোর্টে লিখেছেন, "On the whole the examination of this section has been rather unfavorable this year, owing probably to the disadvantage the Head Master laboured under in having to teach two different sets of boys, besides devoting some attention to the last class, which is without a teacher, in addition to his duty of general superintendence." (১৮)

নবম বছরে (১৮৫২-১৮৫৪ সাল) হাওড়া স্কুলের কমিটিতে দুটি পরিবর্তন হল, ম্যাজিস্ট্রেট জেনকিন্‌স্-এর বদলে এলেন ম্যাজিস্ট্রেট ওয়ার্ড সাহেব আর ম্যাক্‌ক্রি-র বদলে এলেন সিভার্স সাহেব।

শিক্ষক চারজন অপরিবর্তিত থাকলেন। পঞ্চম শিক্ষক হিসেবে ১০ ফেব্রুয়ারি, ১৮৪৫ তারিখে যোগ দিলেন চন্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মাসিক বেতন ২০টাকা।

১৮৫৪ সালে স্কুলে মোট ছাত্র সংখ্যা ছিল ১৬৩ জন। এর মধ্যে ১৫৯ জন হিন্দু, ২ জন খৃষ্টান এবং ২ জন মুসলমান। এদের সকলেই স্কুলে ফি দিয়েই পড়াশুনা করতেন। এরা সকলেই পড়তেন কেবল দুটি ভাষা — ইংরেজি এবং বাংলা; আরবি বা পার্শি এমন কি সংস্কৃত ভাষাও কেউ পড়তেন না।

১৮৫২-এর অক্টোবর থেকে ১৮৫৪-এর এপ্রিল পর্যন্ত স্কুল ফি এবং ফাইন থেকে পাওয়া গিয়েছিল মোট ৩২৪১ টাকা ৭ আনা। পাঁচজন শিক্ষক এবং চারজন পরিচারকের মোট মাইনে ২৮৫ টাকা, আনুষঙ্গিক খরচ মাসে ৬ টাকা; প্রতিবছর প্রাইজ দেবার জন্য খরচ ৯৫ টাকা। এরপর আছে অফিসারদের বেতন ৫০৮৮ টাকা ৯ আনা ১ পাই; তার আনুষঙ্গিক খরচ ৬৬ টাকা ১৩ আনা; স্কুলবাড়ির মেরামতিতে খরচ ৪৬০ টাকা এবং অস্থায়ী স্কুলবাড়ির ভাড়া হিসেবে ৪০ টাকা।

১৮৫৩ সালের ডিসেম্বরে হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ হাওড়া স্কুলে এসে পরিদর্শন করে গেলেন। ছাত্রদের অগ্রগতি এবং স্কুলে পড়াবার পদ্ধতি দেখে শুনে তিনি খুবই সন্তোষ প্রকাশ করলেন।

হাওড়া স্কুল কমিটির সচিব আলেকজান্ডার সাহেবও পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে স্কুলের যাবতীয় সবকিছু পর্যবেক্ষণ এবং পরিদর্শন করে যে রিপোর্ট দিলেন, তাতে তিনি একজায়গায় লিখছেন, "On the whole I was much satisfied with the progress of the boys in this section, which is creditable to babu Bhoodeb Mookerjee, the Head Master." অর্থাৎ ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের ভুয়সী প্রশংসা করলেন তিনি।

এবার দেখি, কি কি পড়ানো হত হাওড়া স্কুলে ঐ সময়ে।

প্রথম শ্রেণিতে ঃ Practical Reader III; Keighteey's History; Stewart's Geography; Crombie's Grammar; Geometry ; Algebra ; Arithmetic এবং Vernacular

দ্বিতীয় শ্রেণিতে ঃ Moral Tales : History of Greece; Stewart's Geography : Crombie's Grammar; Arithmetic; Vernacular

তৃতীয় শ্রেণিতে ঃ Moral Class Book ; Brief Survey of History; Clift's Geography ; Lennie's Grammar; Arithmetic এবং নীতিবোধ।

চতুর্থ শ্রেণিতে ঃ Prose Reader II; Wilson's Elements of Grammar; Clift's Geography; Arithmetic এবং বোধোদয়।

পঞ্চম শ্রেণির প্রথম বিভাগে Prose Reader I ; Arithmetic এবং শিশুশিক্ষা।

পঞ্চম শ্রেণির দ্বিতীয় বিভাগে ঃ Murray's Spelling Book ; Arithmetic এবং শিশুশিক্ষা।

এছাড়া রিপোর্টে সচিব আরো বলেছেন, স্কুল লাইব্রেরিটি ভাল।

আরো বলা হয়েছে, স্কুল বাড়িটি ১৮৫২ সালের ডিসেম্বরে আদ্যোপান্ত মেরামত করা হয়েছে। ফলে বাড়িটি এখন দারুণ সুন্দর হয়েছে। কিন্তু কমিটি পাখার ব্যবস্থা না করতে পারার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছে, যদিও কমিটি মনে করে পাখার প্রয়োজন খুবই।

স্কুলে একটা ভিজিটিং বুকও রাখা হয় স্কুলের উন্নয়ন সম্পর্কে সাজেশন আহ্বান করার জন্য। (১৯)

পরের বছর অর্থাৎ ১৮৫৫-১৮৫৬ সালের শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট থেকে জানা যাচ্ছে, ভূদেব মুখোপাধ্যায় তখনও প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করছেন। স্কুল সচিব রয়েছেন সেই আলেকজান্ডার সাহেব। রিপোর্টের শুরুতেই লেখা হয়েছে, "This School continues to be very efficiently managed, and is steadily rising in reputation. The number of pupils on the Rolls is 236 and the average schooling -fees per mensem amount to Rupees 260."

এই সময়টার চতুর্থ শ্রেণির অংক এবং বাংলা ক্লাসের পরীক্ষা নিতেন প্রধান শিক্ষক ভূদেব মুখোপাধ্যায়। এ বিষয়ে তিনি নিজে কী বলছেন শুনি ঃ "The result of the Examination in the former branch of study was very unfavourable, and in the latter, although a great deal has been done to improve the Reading and Orthography of the pupils, yet they have much to unlearn of what they acquired in the Pathsalas before they can attain fluency and correctness in Reading and Writing. " (২০)

পরের বছর ১৮৫৬-১৮৫৭ সালের শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে উল্লিখিত হল হাওড়া স্কুল থেকে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের বদলি হয়ে চলে যাওয়ার কথা। "On the 21st of June 1856, Babu Bhoodeb Mukerjee, the late Head Master, was appointed Superintendent to the Vernacular Normal School at Hooghly, and Mr. Thomas Cowpar of Noakhally nominated to succeed him in office."(২১)

ভূদেব মুখোপাধ্যায় হাওড়া স্কুল থেকে প্রোমোশন নিয়ে চলে গেলেন হুগলীর নর্মাল স্কুলে। সেখানে তাঁর বেতন ছিল মাসিক ৩০০ টাকা।

লোকনাথ ঘোষ লিখছেন, "By his untiring zeal and indefatigable labours a large number of students of his school (Howrah School) sucessfully passed the Junior Scholarship Examination." (২২)

১৮৯৪ সালের ১৫ মে শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক, পত্রিকা পরিচালক ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের জীবনাবসান ঘটে। হাওড়া স্কুল আজও "হাওড়া জেলা স্কুল" নামে সগৌরবে চলছে তাঁর অবদানকে স্মরণে রেখেই।

সম্পাদকীয় সংযোজন ঃ প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে এর পর প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন উমেশচন্দ্র দাস। তিনি এরপর থেকে অর্থাৎ ১৮৫৬-১৮৮৭ পর্যন্ত টানা ৩১ বছর প্রধান শিক্ষক ছিলেন। মধ্য হাওড়ার একটি গলি তাঁর নামে নামকরণ করা হয়েছে। সেই গলিরই ১ নম্বর বাড়িতে আছে পশ্চিমবাংলার একমাত্র সরস্বতী মন্দির, মন্দিরে উমেশচন্দ্র পূজিত রাজস্থানী ঘরানার তৈরী শ্বেতপাথরের সরস্বতী মূর্তি বিদ্যমান।

তথ্যসূত্র ঃ

(১) Bengal District Gazetteers : HOWRAH by L.S.S. O'Malley and Monmohan Chakravarti, 1909, P : 140.

(২) General Report on Public Instruction, The Bengal Presidency, 1845-46 P : 175

(৩) GRPI, 1846-47, P : 172, 173.

(৪) GRPI, 1847-48, P : 154.

(৫) GRPI, 1848-49, P : 169.

(৬) GRPI, 1848-49, P : 170.

(৭) GRPI, 1848-49, P : 170.

(৮) GRPI, 1848-49, P : 309.

(৯) GRPI, 1848-49, P : 309.

(১০) GRPI, 1848-49, P : 310.

(১১) ভূদেব মুখোপাধ্যায় — ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৬৩, পৃ ঃ ৭-৯।

(১২) The Modern History of the Indian Chiefs, Rajas, Zamindars. & C. Part II, by Loke Nath Ghose, 1881, P : 302.

(১৩) GRPI, 1849-50, P : 216.

(১৪) GRPI, 1849-50, P : 220.

(১৫) Report of the Council of Education, 1849-50, P : 1.

(১৬) GRPI, 1849-50, P : ccxxxix.

(১৭) GRPI, 1850-51, P : 162, 163.

(১৮) GRPI, 1851-52, P : 154.

(১৯) GRPI, 1852-55, P : 132.

(২০) GRPI, 1855-56, P : 158.

(২১) GRPI, 1856-57, P : 361.

(২২) The Modern History of the Indian Chiefs, Rajas, Zamindars, &c. Part II, by Loke Nath Ghose, 1881, P : 302.

সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে কুকুর

ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়

১. (কুক্ আদান ও উর (উরচ) - ক (এখানে ক-এর আগম) = কুক্কুর> ককুর।

সংস্কৃত প্রতিশব্দ ঃ কৌলয়ক, সারমেয়, মৃগদর্শক, শুনক, ভষক, শ্বা, শুন, শুনি, শ্বান, ভষণ, বক্রলাঙ্গুল, বৃকারি, রাত্রিজাগর, কালেয়ক, গ্রাম্যমৃগ, মৃগারি, শূর, শয়ালু।)

২. 'অস্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীতে কুকুরের প্রতিশব্দ হইতেজে ছক্ (খ্মের) , ছুকে (কোন্ টু), ছো (প্রাচীন খ্মের), ছো (আনাম্, সেদাং, কাসেং) , অছো (তারেং), ছু (সেমাং), ছুত্ত (সাকেই)। ..... বাংলা চু চু বা তু তু আস্ট্রিক প্রতিশব্দ হইতেই গৃহীত এবং চু চু বা তু তু বলিতে কুকুরার্থক বাংলা দেশজ শব্দ; ওটা শুধু ধ্বন্যাত্মক ডাক মাত্র নয়, চু চু বা তু তু বলিতে ককুরই বোঝায়'। (বাঙালির ইতিহাস ঃ আদি পর্ব, নীহারঞ্জন রায়। বৈশাখ ১৪০০, কলকাতা)

৩. ঋগ্বেদের দশম মন্ডলের ১০৮ সংখ্যক সূক্তে দেবরাজ ইন্দ্রের দূতীরূপী দেবশুনী অর্থাৎ দেবতাদের কুক্কুর সরমার কথা আছে। সে একদল মজুতদারকে জব্দ করে ধনদৌলত নিয়ে ফিরে এসেছিলো । এই সূক্তটিকে 'সংবাদ সূক্ত' বলা হয়েছে। বেদে কাব্যনাটকের যে তথ্য পাওয়া যায় সেখানে আছে 'যম - যমী সংবাদ', 'পুরূরবা - উর্বশী সংবাদ', 'সরমা - পণি সংবাদ'। কথোপকথনের রীতিতে রচিত মন্ত্রমালা। যাস্কের নিরক্ত অনুসারে 'পণি' মানে বণিক (পনির্বনিগ ভব্তি।) পণিরা বাণিজ্য করে, লেনদেনের ব্যবসা করে, এরা দেবতাদের পূজা - উপচার দেয় না; এমনকি পুরোহিতদেরও প্রাপ্য দক্ষিণা থেকে বঞ্চিত করে। সে যুগে পণিরা ছিল ঠগ, তারা গরুকে আটকে রাখে ও অন্যান্য অনেক দুষ্কর্মও করে। বিদেশি ভারততত্ত্ববিদরা মনে করেন, পণিরা ভবঘুরে বাণিজ্যিক গোষ্ঠী। গ্রীক ঐতিহাসিক স্ট্র্যাবো পর্ণিয়ান (Parnian) নামে এক জনজাতির কথা বলেছেন। সরমা কথার অর্থ সরণশীল (সরণাং ইতি সরমা) অর্থাৎ এরা চলমান জনগোষ্ঠীর প্রতিভূ। এরা পণিদের তাড়িয়ে বেড়াতো দেশ থেকে দেশান্তরে। দেবতারা ছল জানতেন। তাই যে সে কুকুর না পাঠিয়ে সরমা কুক্কুরীকে নিযুক্ত করা হলো পণিদস্যুদের শায়েস্তা করার জন্য। এখানেও যেন আর্য - অনার্যদের সংঘর্ষের একটা ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। সারমেয় শব্দটিকে সরমা জাত (সরমা + ঢেঞয় অপত্যার্থে সারমেয়।)

প্রাচীন সাহিত্য বেদে যেমন দেবতাদের ককুর সরমার উল্লেখ আছে, প্রাচীনতম শিল্প নিদর্শন সিন্ধু সভ্যতায় ককুরের পোড়ামটির মূর্তি পাওয়া গেছে। তবে শিল্প সাহিত্যে ককুর তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে উপস্থিত হলো জাতক কাহিনীতে আর গান্ধার শিল্পকলায়।

ছান্দোগ্য উপনিষদের ১ম স্কন্ধে সারমেয় কুলের কথা আছে। সেখানে গ্লব মৈত্রেয়ের কাছে গিয়ে ককুয়ের দল তাদের খাবার এনে দেবার অনুরোধ করেছে। কেউ কেউ মনে করেন এরা জানোয়ার কুকুর নয়। প্রাচীন ভারতে ককুর নামে এক মানবগোষ্ঠী ছিল — এরা তাদেরই প্রতিনিধি।

৪. মহাভারতে, বিষ্ণুপুরাণ ইত্যাদিতে ককুরজাতির উল্লেখ আছে। ছান্দোগ্য উপনিষদের সারমেয়গুলির মাধ্যমে ভারতীয় দার্শনিকতার বস্তুমুখীন দিকের কথা যেমন আছে, তেমনি মহাভারতের মহাপ্রস্থান পথনির্দেশী ককুরটি হোলো আধ্যাত্মিকতার সূচক - প্রতীক। যুধিষ্ঠির সব কিছু অতিক্রম করে স্বর্গলোকের দ্বারপ্রান্তে এসেও স্বর্গে প্রবেশ করতে চাননি। যুধিষ্ঠির পার্থিব জীবনের সব কিছু তুচ্ছ জ্ঞান পথ ককুরকে যে ছাড়তে পারলেন না তার অর্থ মনে হয় এইরকম যে, জীবনের সমস্ত আকর্ষণ বিকর্ষণ সাঙ্গ হবার পরেও যা থাকে, তাই হলো ধর্ম। মহাপ্রস্থানের পথের সঙ্গী ককুরটি সেই অধ্যাত্ম অনুভূতিরই প্রতীক বলে মনে হয়।

৫. রামায়ণ থেকে জানা যায় যে, ভরত মাতামহালয় থেকে প্রত্যাবর্তনের কালে কেকয়রাজ তাঁকে ব্র্যাঘ্রতুল্য বলশালী কয়েকটি ককুর উপহার দেন। অযোধ্যাকান্ডের ৭০ সর্গে আছে ঃ

সৎকৃতা ককেয়ো রাজা ভবতায় দদৌ ধনম্।
আন্তঃপুরেহতি সংবৃদ্ধান ব্যাঘ্রবীর্যবলোপমান্।
দংস্ট্রায়ুধান মহাকায়ান শুনশ্চোপায়নং দদৌ।

মহাভারতে ককুরের উল্লেখ আছে জন্মেজয়ের যজ্ঞস্থলে। যজ্ঞের আয়োজন সমাপন হলে দেবককুর সরমার কয়েকটি পুত্র যজ্ঞস্থলে প্রবেশ করলে যজ্ঞদ্রব্য অবলেহনের ভয়ে তাদের প্রহার করে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। দেবশুনী সরমা এর ফলে ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দেয় যে জন্মেজয়ও যজ্ঞে কোন অদৃষ্ট ও অভাবনীয় ভয়ে ভীত হবে। সরমা শাপের এই অদৃষ্ট ভয় সম্ভবত যজ্ঞে আস্তীকাগমন, যার ফলে যজ্ঞ পরিপূর্ণ হলো না। ভোজরাজের 'যুক্তিকল্পতরু' গ্রন্থে গুণানুসারে তিন প্রকার ককুরের কথা বলা হয়েছে — সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। চাণক্য নীতিতে ককুরের গুণাগুণ বর্ণিত হয়েছে। বরাহমিহিরও ককুরের কতকগুলি শুভাশুভ লক্ষণের কথা বলেছেন।

৬. সংস্কৃতবিৎ পাশ্চাত্য পন্ডিতদের মতে সারমেয় গ্রীকদের প্রাচীণ পুস্তকে 'হারমেয়স' বা 'হারমেস্' নামে বর্ণিত। ইনি গ্রীকদেবতাদের দূত রূপে কথিত। গ্রীকপুরাণের আরণ্যদেবী আর্টেমিস-এর শিকারী

কুকুর আছে। তিনি রাজা সাইনসকে দৈবকুকুর উপহার দিয়েছিলেন। গ্রীক পুরাণে সারবেমল নামে এক দানব কুকুরের কথা আছে যার তিনটি মাথা। সারবেমল গ্রীক পুরাণে বর্ণিত দানব টাইফন, দানবী একিদনার সন্তান।

হাদিস শরিফেও কুকুর প্রসঙ্গ বহুবার এসেছে। এর বিস্তৃত বর্ণনা আছে আবদুর রহমান খাঁ অনূদিত হাদিস শরিফ-এর দ্বিতীয় খন্ডে। ভারতবর্ষের মালায়ালাম, তামিল, পঞ্জাবী লোকসংস্কৃতিতে কুকুর বিষয়ক ভাবনার প্রকাশ আছে। যেমন মালায়ালাম — 'কুকুরের দশটা ছা হলে কি উপকার, গরুর এক বাছুরেই যথেষ্ট'।

জার্মান, ইতালীয়, পর্তুগীজ, ওলন্দাজ (ডাচ) দিনেমার ফরাসি, রুশ ভাষায় রচিত লোকসাহিত্যে কুকুরের অবস্থান লক্ষ করা যায়।

আফ্রিকান লোকপুরাণে আছে, পূর্বে মানুষদের মধ্যে মৃত্যু ছিল না। কুকুরের জন্য নাকি মানবসমাজে মৃত্যুর আগমন ঘটেছে। চৈনিক লোকপুরাণে কুকুরের সঙ্গে চীনা সম্রাট কন্যার বিবাহের কথা আছে। প্রাচীন মিশরের লোকপুরাণে কুকুর নীলনদের দেবতারূপে চিহ্নিত। আলবেনিয়া, পোলিশ, হাঙ্গেরি, বুলগেরিয়া, আইস্‌ল্যান্ড, ফিনিস, লাতিন, সুইডিশ, হিন্দি, গুজরাটি, কাশ্মীরী, ভোজপুরী, মিশরীয়, আরবি, চীনা প্রভৃতি ভাষাতে কুকুর বিষয়ক বহু প্রবাদ গড়ে উঠেছে। যেমন ঃ

১. চীনা ঃ মানুষ করেছি কুকুরটাকে, কামড়ায় আজ আমারই হাতে

২. লাতিন ঃ কুকুর কি কুকুরের মাংস খায়?

৩. সাইবেরিয়া ঃ কুকুরের ভাই কুকুর। ইত্যাদি

৭. বাংলা ছড়ায়, প্রবাদ প্রবচনে কুকুরের প্রসঙ্গ বার বার এসেছে। রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক সংগৃহীত ছড়ায় বেশ কয়েকবার কুকুরের উল্লেখ আছে। যেমন ঃ

১. ছাই গাদায় ঘুম যায় খেঁকি কুকুর।
খাট পালঙে ঘুম যায় ষষ্ঠী ঠাকুর।

২. ঘোড়া ঘরে নিদ পাড়ে কালা কুকুর।
আমাদের ঘরে নিদ পাড়ে খোকা ঠাকুর।

দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত 'মৈমনসিংহ গীতিকা'র 'মহুয়া' পালায় কুকুরের প্রসঙ্গ আছে। যেমন ঃ

শিকারী কুকুর লইল শিয়াল হেজা ধরে।
মনের সুখেতে চলে বৈদেশ করিবারে।।

বাদ্যকর রূপেও কুকুরের চিত্র আছে ঃ

১. কুকুর বাজায় টুমটুমি
বানর বাজায় ঢোল।

২. কানাছেড়ির বিয়ার মইধ্যে
কুত্তায় বাজায় শিঙ্গা।

কুকুর কেন্দ্রিক বহু প্রবাদও বাংলা লোকসাহিত্যে পাওয়া যায়

১. অভাগা চোর যে বাড়িতে যায়
কুকুর ডাকে নয় রাত পোহায়।

২. আষাঢ়ে গগন ফাটে কুকুরের হান্ডি চাটে।

৩. কুকুরকে নাই দিলে ঘাড়ের উপর চড়ে।

৪. কুকুরের লেজে তেল দিলে কখনো সোজা হয় না।

১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'বিশ্বের একশো আঠার ভাষার প্রবাদ' গ্রন্থে কুকুর প্রসঙ্গে বহু প্রবাদ আছে।

৮. কৃত্তিবাসী রামায়ণের আদিকান্ডে, কাশীদাসী মহাভারতের আদিপর্বে, বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবত' ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃতে' কুকুরের উল্লেখ আছে। দ্বিজ মাধবের 'মঙ্গলচন্ডীর গীতে' আছে যে দিনের বেলায় কুকুরের কান্না অশুভ। ঘনরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গলে এবং রামেশ্বরের শিবায়ন কাব্যে কুকুরের উল্লেখ আছে।

বাংলার মন্দিরের টেরাকোটা ভাস্কর্যে কুকুরের স্থান বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

৯. কয়েকটি মন্দিরের উল্লেখ করা হলো যেখানে এক ধরনের ঘোড়ায় টানা গাড়িতে কোনো ভূস্বামী বা সাহেব চলেছেন আর সেখানে ঘোড়ার নিচে ছুটন্ত কুকুর। যেমন ঃ বর্ধমান জেলার আমোদপুরের বড় কালীতলার শিবমন্দির, হুগলী জেলার আঁটপুরে রাধাগোবিন্দের আটচালা মন্দিরের দেওয়াল, ঐ জেলার হরিপালের রায়পাড়ার আটচালা মন্দির, উত্তর চব্বিশপরগণার হালিশহরের নন্দকিশোর মন্দির ইত্যাদি। আবার চলমান পাল্‌কির নীচেও ধাবমান কুকুরের পোড়ামাটির ভাস্কর্য আছে, হুগলী জেলার হরিরামপুরের আটচালা শিল্পমন্দির, কোটালপুরে আটচালা শিবমন্দির, রাজবলহাটের রাধাকান্ত জিউর আটচালা মন্দির, মেদিনীপুর জেলার দাসপুর থানার চেঁচুয়া গোবিন্দনগরের রাধাগোবিন্দ জিউর মন্দির ইত্যাদি। বর্ধমান জেলার দেবীপুর গ্রামের সিংহ পরিবারের মন্দির ভাস্কর্যে হাতির পিঠে বসা তিনজন শিকারী, পদাতিক সৈন্যদল আর হাতির নীচে শিকারী কুকুর, হুগলী জেলার বাঁশবেড়িয়ার মন্দিরে অশ্বারোহী যোদ্ধার ঘোড়ার নিচে ধাবমান কুকুর। এমন আরো অনেক দৃষ্টান্ত আছে।

১০. বাংলা সাহিত্যে কুকুর কেন্দ্রিক ছোটগল্প হলো ঃ

১. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ সুকু ও ভুকু, ডগি - এ্যালসোশিয়ান নয়।

২. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ দেওঘর স্মৃতি

৩. সতীনাথ ভাদুড়ী ঃ ঈর্ষা, ধস।

৪. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ গৌড়মল্লার (উপন্যাস)।

৫. বনফুল (বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়) ঃ খেঁকি, মন্ত্রমুগ্ধ।

৬. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'আমি কীরকম ভাবে বেঁচে আছি' কবিতার একটি ছত্র ঃ 'আমি মানুষের পায়ের কাছে কুকুর হয়ে বসে থাকি — তার ভেতরের কুকুরকে দেখব বলে।'

চৈতন্য সংস্কার ঃ গণচেতনার অভ্যুত্থান

ড. ঋতব্রত বসুমল্লিক

উনিশ শতকের নবজাগরণকে কেন্দ্র করে বাঙালিচেতনার উত্থান ঘটেছে বলেই আমরা মনে করি। পাশ্চাত্য ভাবনার অনুসরণে এই চেতনা সমীভূত। কিন্তু সেই ভাবনা যতখানি নগরকেন্দ্রিক ততখানি মানবিক ও গণচেতনার অনুসারী নয়। এই চর্চা মূলতঃ কলকাতা কেন্দ্রিক এলিট শ্রেণীর অধিকার-ই ছিল বলা চলে। সনাতন হিন্দুধর্মচর্চা, ব্রাহ্মধর্মচর্চা সবই হয়েছে নিজের মতো করে। অথচ ষোড়শ শতকে এই বাংলার বুকে যে গণজাগরণ ঘটেছিল তাকে অস্বীকার করার জো নেই। শুধু সংস্কৃতভাষাকে আয়ত্ত করে, বৈয়াকরণ রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে, অল্পবয়সে টোল খুলে পাঠদানের মাধ্যমে বাহ্যিক সংস্কার আর সন্ন্যাস গ্রহণের পর বহুজনহিতায় নিজেকে উৎসর্গকরণ - নবদ্বীপের বিশ্বম্ভর মিশ্রের এই সংস্কার গণচেতনার এক ঐতিহাসিক দলিল। লক্ষ্যণীয় যে, এই সংস্কার ঘটেছে শিক্ষা, সংস্কৃতি, সমাজ, সাহিত্য - সর্বক্ষেত্রেই। একটি জাতির জীবনধারণের জন্য যে সকল বিষয়ের প্রয়োজন, যে বিষয়গুলি মানুষের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ উন্নতিতে সহায়তা করে তার বীজবপন থেকে শুরু করে বিকাশের ধারাপথটিকে ষোড়শ শতকে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যই জনমানসে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথের ভাষায় —

''ঘরের ছেলের চক্ষে দেখেছি বিশ্বরূপের ছায়া।
বাঙালীর হিয়া অমিয় মথিয়া নিমাই ধরেছে কায়া।।''

সংস্কার বলতে বোঝায় সমানভাবে সবকিছু করা। সম্ পূর্বক কৃ ধাতু থেকে এই শব্দটি নিষ্পন্ন। সমানভাবে সবকিছু করা মানে মানবজাতির বৌদ্ধিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তার আত্মিক বিকাশের দিকটিকেও উৎকর্ষতা দান। শ্রীচৈতন্যের স্পর্শে বাঙালীর এই উভয় দিকই চৈতন্যময় হয়ে উঠেছিল। একথা ঠিক যে, উনিশ শতকীয় চিন্তায় বহুজনের মিলিত চেতনার প্রকাশে গণজাগরণ ঘটেছিল। সেখানে সাময়িক পত্র ছিল, বিভিন্ন সভা (যেমন সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ, তত্ত্ববোধিনী সভা ইত্যাদি)-র মাধ্যমে প্রাজ্ঞ ও বিদ্বজ্জনের মতকে প্রকাশের সুযোগ ছিল। কিন্তু ষোড়শ শতকের বাংলায় এই মতপ্রকাশ তো দূরের কথা, শিক্ষিত হয়ে স্বাধীনভাবে চিন্তা করার কোন অবকাশ-ই ছিল না। ব্রাহ্মণ ও উচ্চবর্ণীয় ছাড়া শিক্ষার অধিকারের কথা সমাজের নিম্নশ্রেণীর লোকেরা কল্পনাও করতে পারতো না। দম্ভ, দর্প আর অহংকারে সমাজ ছিল পূর্ণ। বৃন্দাবনদাস 'চৈতন্যভাগবত'-এ এঁকেছেন এই সামাজিক সমস্যার বাস্তব ছবি -

'' 'ধর্ম্মকর্ম্ম' লোক সভে এইমাত্র জানে।
মঙ্গল চন্ডীর গীত করে জাগরণে।।
দম্ভ করি বিষহরী পূজে কোন জন।
পুত্তলি করয়ে কেহো দিয়া বহুধন।।
ধন নষ্ট করে পুত্র-কন্যার বিভার।
এইমত জগতের ব্যর্থ কাল যায়।।

না বাখানে যুগধর্ম্ম - কৃষ্ণের কীর্ত্তন।
দোষ বিনা গুণ কার না করে কথন।।

সকল সংসার মত্ত ব্যবহার রসে।
কৃষ্ণপূজা বিষ্ণুভক্তি কারে নাহি বাসে।।''

(চৈতন্যভাগবত আদিখন্ড - ২/৬০-৬২, ৬৫, ৮২)

এই বর্ণনা প্রমাণ করে দেয় সেকালের মানুষের অবস্থানটিকে। বাহ্যিকতা এবং ঐশ্বর্য প্রদর্শনের প্রতিযোগিতা তখনও ছিল - এখনও আছে। পার্থক্য কেবল স্থান ও কালগত। এই যে বৃন্দাবন দাসের বক্তব্য - 'দোষ বিনা গুণ কার না করে কথান।।' - এখান থেকে সেকালের মানুষের পরশ্রীকাতরতাটিকে চিনে নেওয়া যায়। আজকের মানুষেরও যে এই ধর্ম নেই তা নয়, তবে পরিবেশ ও পরিস্থিতির নিরীখে তা তখনকার মতো প্রবল নয়। 'সকল সংসার মত্ত ব্যবহার রসে।' - এই বিষয়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ। ব্যবহার রসে মানুষ এখনো মত্ত আছে, তখনো মত্ত ছিল। তবে এখনকার ব্যবহার রসের মাদকতা নিজ ঐতিহ্য বিস্মৃতি, অন্ধ পরানুকরণমত্ততা। সেকালের ব্যবহারিক মাদকতা কিন্তু স্বীয় ঐতিহ্য বিস্মৃতি ছিলনা। ছিল ঐতিহ্যের ভেতরে থেকে আপন অহংকার এবং ঐশ্বর্য প্রকাশের এক প্রচন্ড আকৃতি। আর তাই -

''সভে 'মহা অধ্যাপক' করি গর্ব্ব ধরে।
বালকেও ভট্টাচার্য্য সনে কক্ষা করে।।
নানা দেশ হিতে লোক নবদ্বীপে যায়।
নবদ্বীপে পড়ি লোক বিদ্যারস পায়।।

যেবা ভট্টাচার্য্য, চক্রবর্ত্তী, মিশ্র সব।
তাহারাও না জানয়ে গ্রন্থ - অনুভব।।''

(চৈতন্য ভাগবত আদিখন্ড - ২/৫৫-৫৬,৬৩)

অনুভব শূন্যতা যে তখনকার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ছিল তা নিশ্চিতভাবেই চৈতন্যজীবনীকার জানিয়েছেন। এই বর্ণনায় কোন অতিরঞ্জন নেই। কারণ অস্পৃশ্যতা, জাতিভেদ, বর্ণভেদ প্রভৃতি সামাজিক অনুশাসনের যে প্রমাণ ইতিহাস দিয়েছে তার সঙ্গে এই কথন সম্পূর্ণ সঙ্গত। আজ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে শিক্ষার

অধিকারকে যে মান্যতা দান করা হচ্ছে শচীনন্দন গৌরাঙ্গ সেই মধ্যযুগে বসে টোল খুলে যে অধ্যাপনা শুরু করেছিলেন সেখানে বামুন, কায়েত, তাঁতি, ধোপার কোন ভেদ ছিল না সকলকেই তিনি শিষ্যত্বের অধিকার দিয়েছিলেন। দিগ্বিজয়ী পন্ডিত কেশব কাশ্মীরি কে তর্কে পরাস্ত করা, তাঁর কৃত অলঙ্কারবহুল গঙ্গাস্তোত্র মাত্র একবার শ্রবণ করে সেই শ্লোকের ত্রুটিনির্দেশ চৈতন্যের সংস্কারসাধনের একটি দিক। পন্ডিত কেশব কাশ্মীরি পরাজিত হওয়ার পর প্রভুর শরণাপন্ন হলে তিনি তাঁকে বলেছিলেন —

'' 'দিগ্বিজয়ী করিব' বিদ্যার কার্য্য নহে।
ঈশ্বর ভজিলে, সে বিদ্যার সভে কহে।''

(চৈতন্য ভাগবত আদিখন্ড - ৯/১৭৩)

অর্থাৎ বিদ্যা বিনয়ী করে, নম্র করে, মুক্ত করে - 'সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে।' - এখানে চৈতন্য - কথিত ঈশ্বর হলেন আপন ঈশ্বরত্ব যা প্রতিটি মানুষের ভেতর বিরাজ করছে। শিক্ষা সেই অন্তর্নিহিত পূর্ণতার সন্ধান মানুষকে দেয়। স্বামীজীর কথায় - ''Education is the manifestation of perfection already in man'' বিদ্বান কখনো অহংকার করবে না। এটাই গৌরাঙ্গের শিক্ষা। শুধু তাই নয়, সন্ন্যাস গ্রহণানন্তর তাঁর মুখোদিত যে, 'শিক্ষাষ্টক' সেখানে বৈষ্ণবের আচরণ সম্পর্কে তিনি বলেছেন —

''তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।।''

অর্থাৎ, তৃণ বা ঘাসের চেয়েও নীচু হবে, তরু বা বৃক্ষাদি অপেক্ষা সহিষ্ণু হবে, অনামী ব্যক্তিকেও মান দেবে আর সর্বদা হরিনাম করবে। সহ্য করার উপর জোর দিয়েছেন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য। পরবর্তীকালেও আমরা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীমুখ থেকে একই কথা শুনলাম - ''যে সয় সে রয়। যে না সয়, সে নাশ হয়।'' - আর আজ এই সহ্যশক্তিটাই আমাদের মধ্যে থেকে হারিয়ে গেছে। জীবনযাপনের অন্যতম উপকরণ যে সংযম, শুচিতা - তাও শিখিয়েছেন শ্রীচৈতন্য। সনাতন গোস্বামীকে দেহত্যাগ করা থেকে নিবৃত্ত করে তাঁকে জীবনের পরম সাধনার সন্ধান দিয়ে জীবনের পরমানন্দ লাভের পথ দেখিয়েছেন। অবধূত নিত্যানন্দকে বাংলায় পাঠিয়ে বিবাহ করে সংসারী হতে নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা তিনি জানতেন যে সকলে যদি তাঁর অনুগমন করে সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করে তাহলে সৃষ্টিরক্ষা সম্ভব নয়। তাছাড়া যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রাণপ্রতিষ্ঠা তিনি করে গেলেন তাকে রক্ষা করতে গেলে এই ধর্মকে ঘরে ঘরে ছড়িয়ে দিতে হবে। অতএব গৃহস্থ বৈষ্ণব গড়ে তুলতে হবে যাঁরা এই ধর্মকে ছড়িয়ে দেবেন ঘরে ঘরে। তিনি নিজে কোন দল তৈরি করেননি, কিন্তু সম্প্রদায় গঠনের প্রয়োজনীয়তাকে অনুভব করেছিলেন।

গৌরাঙ্গের মূল সংস্কারের জায়গা কিন্তু সামাজিক প্রতিকূলতার

সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আঁকা এই ছবিটি শ্রীনিবাস আচার্যের বাড়িতে ছিল পরে আড়িয়াদহের মল্লিকদের বাড়িতে স্থান পায়, শ্রীরামকৃষ্ণ এই ছবি মাঝে মাঝে দেখতে যেতেন

বিরুদ্ধে। টোল খুলে অব্রাহ্মণকে শিক্ষালাভের সুযোগদানের কথা আগে উল্লিখিত হয়েছে। এছাড়া আপামর মানুষের সঙ্গে অনায়াসে মিশে গিয়ে তাদের একজন হয়ে ওঠার বিরল কৃতিত্বের অধিকারী কেবল নদীয়াবিহারী শ্রীগৌরহরি। চৈতন্যের সংস্কার অনেকের মতেই ধর্মীয়, তবে একটি কথা মনে রাখা জরুরী যে ধর্মের পথ দিয়ে এলেও তা সামাজিক সংস্কার সাধন করবেই। কেননা মানুষ সমাজবদ্ধ জীব, সে একাই হোক আর সঙঘবদ্ধ ভাবেই হোক চেতনার উজ্জীবনে তার সংলগ্ন সমাজ কিছুটা হলেও পাল্টাতে বাধ্য। কলসী পাথরের উপর রাখতে রাখতে যেমন পাথর ক্ষয় পায়, তেমনি সামাজিক দিক থেকে বঞ্চিত মানুষ যখন কোণঠাসা হয়ে যায় তখন তার আত্মশ্রদ্ধার জায়গা গড়ে ওঠে। প্রচলিত ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির সাঁড়াশি আক্রমণের চাপে পড়ে সেইসময় মানুষের মনে ত্রাহি ত্রাহি রব উঠেছিল। একদিকে মুসলমান শাসকের অত্যাচার আর অন্যদিকে নিজের দেশের লোকের জাতপাত, ধর্ম, বর্ণ নিয়ে তীব্র অসহযোগিতা - এই শাঁখের করাতের মধ্যে পড়ে তখন মানুষ এক সম্পূর্ণ ভিন্ন চিন্তাকে স্বাগত জানানোর জন্য অন্তরে প্রস্তুতি নিচ্ছিল বলা চলে। নিমাই সেই যন্ত্রণার জায়গাটি বুঝতে পেরেছিলেন। অসার শিক্ষা এবং শাস্ত্রচর্চার ফলহীনতাকে তিনি তাঁর প্রকৃত শিক্ষা ও অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই শচীমাতা যখন নিমাইকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন —

'' 'মা'য়ের বোলে ''আজি বাপ, কি পুঁথি পঢ়িলা?
কাহার সহিত কিবা কন্দল করিলা?'' ''

(চৈতন্য ভাগবত মধ্যখন্ড - ১/১৯২)

তখন কৃষ্ণভক্তির শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলে নিমাই'র বক্তব্য ছিল এই -

''চন্ডাল চন্ডাল নহে যদি কৃষ্ণ বোলে।
বিপ্র নহে বিপ্র - যদি অসৎপথে চলে।।''

(চৈতন্য ভাগবত মধ্যখন্ড - ১/১৯৬)

লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, ষোড়শ শতকের নব্য ন্যায়চর্চার পীঠস্থান নবদ্বীপে দাঁড়িয়ে একজন বর্ণশ্রেষ্ঠ, বিশিষ্ট নৈয়ায়িক, খ্যাতিমান পন্ডিত বিশ্বম্ভর মিশ্র তথা নিমাই পন্ডিত অসদাচরণ-সম্পন্ন ব্রাহ্মণকুলের ব্রাহ্মণত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন কোন সময় - যখন কিনা নবদ্বীপ চাঁদকাজীর শাসনে এবং দোর্দন্ডপ্রতাপ, মুসলিম শাসকাশ্রিত কুলীন বিপ্রভ্রাতৃদ্বয় জগন্নাথ ও মাধবের সংক্ষেপে জগাই-মাধাই'র অধীনে। ব্রাহ্মণরা কিন্তু নিমাইকে ছেড়ে কথা বলেননি। চাঁদকাজীকে উস্কে দিয়ে নবদ্বীপে বৈষ্ণবদেব সংকীর্তন বন্ধের পাকাপাকি ব্যবস্থা করে ফেলেছিলেন। তাঁদের অভিযোগ ছিল —

''এ বামনগুলা রাজ্য করিবেক নাশ।
ইহা সভা হৈতে হইব দুর্ভিক্ষ প্রকাশ।।
এ বামনগুলো সব মাগিয়ে খাইতে।
ভাবক-কীর্ত্তন করি নানা ছলা পাতে।।
গোসাঞির শয়ন হয় বর্ষা চারি মাস।
ইহাতে কি জুয়ায় ডাকাতি বড় ডাক।।
নিদ্রাভঙ্গ হৈলে ক্রুদ্ধ হয়ব গোসাঞি।
দুর্ভিক্ষ করিব দেশে ইথে দ্বিধা নাঞি।।
কেহো বোলে ''যদি ধান্য কিছু মুল্য চঢ়ে।
তবে ে-গুলারে ধরি কিলাইমু ঘাড়ে।।'' ''

(চৈতন্য ভাগবত আদিখন্ড - ১১/২৫৩-২৫৭)

কী অপূর্ব অভিযোগ! দেশে যদি দুর্ভিক্ষ হয়, ধানের দাম যদি বাড়ে তাহলে সেই দোষও ঐ বৈষ্ণবদের উপর পড়বে। কীর্তন বন্ধে এ কি অদ্ভুত উপায়! দুষ্টবুদ্ধির ব্রাহ্মণগণ রটিয়ে দিয়েছিলেন যে —

''আজি মুঞি দেয়ানে শুনিলুঁ সব কথা।।
রাজার আজ্ঞায় দুই নাও আইসে এথা।।
শুনিলেক নদীয়ার কীর্ত্তন বিশেষ।
ধরিয়া নিবারে হৈল রাজার আদেশ।।'

(চৈতন্য ভাগবত মধ্যখন্ড - ২/২২৯-২৩০)

কিন্তু যার জন্য এতো কিছু তিনি ভয়ও পাননি, আর এই চক্রান্তকারীদের তোষামোদও করেননি। তিনি অকুতোভয়ে গঙ্গাতীরে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন —

''এত ভয় শুনিয়াও ভয় নাহ পায়।
রাজার কুমার যেন নগরে বেড়ায়।।''

(চৈতন্য ভাগবত মধ্যখন্ড - ২/২৪৬)

এই নির্ভয় এবং তোষামোদহীন ছিলেন বলেই তাঁকে সাধারণ মানুষ নিজেদের কাছের লোক বলে তাড়াতাড়ি ভাবতে পেরেছিল। তিনি কিরকম অসাম্প্রদায়িক ছিলেন তা তাঁর কথা থেকেই স্পষ্ট —

''এক অবতার ভজে, না ভজয়ে আর।।
কৃষ্ণ-রঘুনাথে করে ভেদ ব্যবহার।।
বলরাম শিব প্রতি প্রীত নাহি করে।
'ভক্তাধাম' শাস্ত্রে কহে এ সব জনাবে।।''

(চৈতন্য ভাগবত মধ্যখন্ড - ৫/১৪৪-১৪৫)

এই অসম্প্রদায়িকতা জীবনের সংযম পালনের অন্যতম ভিত্তি। শ্রীচৈতন্য হয়তো ধর্মাচরণের ক্ষেত্রে এই অসাম্প্রদায়িক কথা বলেছেন ঠিকই, তবে এই ধর্মবুদ্ধি থেকেই সমাজবুদ্ধির যে বিকাশ ঘটে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

ইতিহাস গণ অভ্যুত্থান নিয়ে যাই বলুক না কেন, একথা ইতিহাসবিদ্ মাত্রই মানবেন যে, পৃথিবীর সব অভ্যুত্থান-ই কিন্তু একেবারে পরিবেশ পরিস্থিতি মেনে সংঘটিত হয়নি এবং তা কখনো সম্ভবপরও নয়। তথাকথিত ইতিহাসের নিরীখে পাশ্চাত্য বিভিন্ন আন্দোলন যথা - ফরাসি বিপ্লব, দুই বিশ্বযুদ্ধ, প্রাচীন রোমে রাজশক্তি ও যাজকশক্তির দ্বন্দ্ব - এই সবই রাজনৈতিক, সমাজজনৈতিক, ধর্মীয় প্রভৃতি কোন নির্দিষ্ট পরিপ্রেক্ষিতকে ঘিরে হয়নি - মানুষকে নব জীবনবোধে প্রতিষ্ঠিত করতেই তিনি এই সংস্কারের পথে হেঁটেছিলেন। সব ধর্মে আছে চাওয়া, আর চৈতন্যের ধর্মে এই চাওয়ার পরিবর্তে আছে শুধু দেওয়া। তিনি নিজেই বলেছেন যে, কিছু চাইনা, কিছু দিওনা, শুধু তোমার পাদপদ্মে যেন জন্মজন্মান্তরে অহৈতুকী ভক্তি লাভ করতে পারি —

'' ন ধনং ন জনং সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনিজন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি।।'' (শিক্ষাষ্টক - ৫)

এই যে কিছু না চেয়ে শুধুমাত্র দেওয়ার আকাঙ্খা - এটিই চৈতন্য সংস্কারের মূল বাণী। সমালোচক বলবেন যে, এই দেওয়া তো ভগবচ্চরণে আত্মনিবেদন। এর সঙ্গে সামাজিকতার সম্পর্ক কোথায়? উত্তরে বলতে হয় যে প্রকৃত ভালোবাসা মানুষের অন্তরকে পবিত্র করে, নিষ্কলুষ করে, উদার করে। ভগবানকে ভালোবাসতে গেলে আগে মানুষকে ভালোবাসতে জানতে হয়, কারণ মানুষের মধ্যেই শ্রীভগবানের প্রকাশ। মানুষের ভেতরেই আছে শিবত্ব এবং পশুত্ব। আপন কর্মের দ্বারা মানুষ যে ভাবকে নিজের ভেতর জাগায় সেই ভাবনা তাকে জীবনপথে চালিত করে। তাই দেওয়া নেওয়ার পরিবর্তে যদি কেবল দেওয়ার বিষয় থাকে, তাহলে সেখানে ধীরে ধীরে কামনা অন্তর্হিত হতে থাকে, মনে আসে তৃপ্তি। কারণ দেওয়ার বদলে পাওয়ায় অভ্যস্ত হয়ে গেলে না পেলে মনের মধ্যে সেই না পাওয়ার যন্ত্রণা

পাওয়ার আকাঙ্খাকেই তীব্রতর করে তোলে। সেই দাবানলের দাবদাহে আমরা দগ্ধ হতে থাকি ক্রমাগত। এই দহন প্রশমনের একটাই উপায় - নিজেকে সংযত করা, আপন দুরন্ত চাওয়ার গলায় লাগাম পরাতে জানা। সেই শিক্ষাই মহাপ্রভু দিয়েছিলেন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে - তবে তা সহিংস পথে নয়। চাঁদকাজী নবদ্বীপের পথে পথে সংকীর্তন বন্ধ করার যে অন্যায় আদেশ দিয়েছিলেন তা শচীনন্দন মানেননি। এই আদেশের বিরুদ্ধে সকল নবদ্বীপবাসীকে একত্রিত করে তিনি বিশাল নগরসংকীর্তন করে কাজীর ভবনে গিয়ে তাকে দিয়ে এই অন্যায় আদেশ প্রত্যাহার করিয়েছিলেন। আপন অধিকার রক্ষার যে গণতান্ত্রিক আন্দোলন আজ সংবিধানে স্বীকৃত, আজ থেকে পাঁচশত বৎসরেরও আগে শ্রীগৌরাঙ্গ এই অহিংস গণতান্ত্রিক জাগরণের সূত্রপাত করেছিলেন। শুধু গণতান্ত্রিক আন্দোলন নয়; উচ্চ ব্রাহ্মণ বংশের সন্তান হয়েও জাতপাতের তীব্র বিরোধিতা করে এক অবিচ্ছিন্ন মানবধর্মের সূচনা করেছিলেন। এলিট ক্লাসের মানুষ হয়েও যে এভাবে একেবারে অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষের কাছে পৌঁছতে পারা যায়, শ্রীচৈতন্যই সর্বপ্রথম এটা দেখালেন। সমাজের সবধরণের চোখরাঙানিকে উপেক্ষা করে এক 'কৃষ্ণনাম'কে অবলম্বন করে অরাজনৈতিক পরিচয় সম্পন্ন একজন মানুষ সমগ্র গৌড়বঙ্গের সংস্কারের ভিত ধরে নাড়িয়ে দিলেন। বৈষ্ণবধর্মের নতুন ভাষ্য রচনা করে দিলেন। বিষ্ণু + ষ্ণ - বৈষ্ণব, এই বুৎপত্তিগত অর্থকে ত্যাগ করে বিষ্ণু শব্দকে ব্যপ্ত্যার্থে গ্রহণ করে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মকে নতুনতর জগতে মুক্তি দিলেন। কিন্তু প্রেমের ঠাকুর গোরাচাঁদ এই কাজটাই করে দেখালেন - ''শ্রীধরের খোলে প্রভু প্রত্যহ অন্ন খায়।।'' (চৈতন্য ভাগবত মধ্যখন্ড - ৯/১৮৪) একটি ব্যাপার লক্ষ্যণীয় যে, অনেকেই সংস্কারক হিসাবে পরিচিত, কিন্তু চৈতন্যের এই সংস্কারের ধারা এতটাই গভীর ছিল যে শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রেই এর প্রভাব পড়েছিল। শ্রীচৈতন্যের 'শিক্ষাষ্টক' ছাড়া আর কিছু লিখিত আকারে পাওয়া যায় না, যদিও এই শিক্ষাকষ্টও তিনি লেখেননি - তাঁর মুখ থেকে এই শ্লোকগুলি শুনে স্বরূপ দামোদর এগুলি লিখেছিলেন এবং পরে শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁর 'পদ্যাবলী'তে এই শ্লোকগুলিকে সংকলন করেছিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজও তাঁর 'চৈতন্য চরিতামৃত'র অন্ত্যখন্ডে এই শ্লোকগুলিকে স্থান দিয়েছেন। মহাপ্রভু কোন সংগঠন তৈরি করেননি, কাউকে মন্ত্রদীক্ষা দেননি। এককথায় তথাকথিত গুরু হননি। তবু চৈতন্য বাঙালীর মর্মে মর্মে জড়িয়ে আছেন। তাঁর প্রত্যক্ষ সংস্কার জাতপাত, প্রচলিত ধর্মচিন্তার বিরুদ্ধে আর পরোক্ষ সংস্কার জড়িয়ে আছে শিল্প, সাহিত্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে। তাঁর একটি বিশেষ অবদান - অবশ্যই পরোক্ষ, সেটি হল চরিতসাহিত্য বা জীবনী সাহিত্য। কারণ মধ্যযুগে এই একজন ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করেই বাংলা জীবনীসাহিত্যের সূত্রপাত হয়েছিল। দেবনির্ভর বা ধর্মনির্ভর সাহিত্যচর্চার যুগে কোন মানবজীবনকে কেন্দ্র করে সাহিত্যরচনা সাহিত্যিক, সামাজিক, ঐতিহাসিক প্রভৃতি সবক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ। মহাপ্রভুকে আমরা অবতার রূপেই বিশ্বাস করতে ভালোবাসি, পূজা করতে ভালোবাসি। তাঁকে ভগবান বলে ভাবতে যতটা ভালো লাগে, মানুষ হিসাবে ভাবতে ততটা ভালো লাগে না। কেননা এই ভাবনাটাও আমাদের সংস্কারে গাঁথা হয়ে গেছে। একটা জিনিষ আমরা ভাবিনা যে, ঈশ্বর যখন নররূপ ধারণ করেন, তখন তিনি নরলীলাই করেন। কারণ —

''কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্বোত্তম নরলীলা
নরবপু তাহার স্বরূপ।'' (চৈতন্য চরিতামৃত মধ্য / ২১)

তাছাড়া পুরুষ থেকে পুরুষোত্তম হয়ে ওঠার শাস্ত্রীয় পদ্ধতি আমাদের হিন্দুধর্মে স্বীকৃত। উপনিষদ্ বলেছেন -

''স যো বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ
ব্রহ্মৈব ভবতি নাস্যাব্রহ্মবিৎ কুলে ভবতি।
তরতি শোকং তরতি পাপ্মানং
গুহাগ্রন্থিভ্যো বিমুক্তোহমৃতো ভবতি।।''

(মুন্ডকোপনিষদ্ ৩/২/৯)

অর্থাৎ, যে কেহ সেই পরব্রহ্মকে জানেন, তিনি ব্রহ্মই হয়ে থাকেন। এঁর কুলে কেউ অব্রহ্মবিদ্ হননা। তিনি মানসসন্তাপ অতিক্রম করেন এবং ধর্মাধর্ম অতিক্রম করেন। তিনি হৃদয়স্থ অবিদ্যাগ্রন্থিসমূহ থেকে মুক্ত হয়ে অমর হন। এই পুরুষোত্তমই কিন্তু ভগবান পদবাচ্য। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও শ্রীভগবান বলছেন যে, যেহেতু আমি ক্ষরাতীত এবং 'অক্ষর' অপেক্ষাও উত্তম, অতএব আমি ত্রিলোকে ও বেদাদি শাস্ত্রে পুরুষোত্তম বলে খ্যাত আছি —

''যস্মাৎ ক্ষরমতীতোহহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোহস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমাঃ।।'' (গীতা ১৫/১৮)

কাজেই চৈতন্য সংস্কৃতি এই পুরুষোত্তম ভাবনার এক জীবন্ত প্রকাশ।

আসলে এই চৈতন্য তথা Self contiousness প্রত্যেক মানুষের ভিতর বিরাজিত। বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত হতে হতে মানুষ যখন মানসিক ভাবে ভেঙে পড়ে তখন তাদের প্রতিবাদের মুখটাকে খুলে দেওয়ার জন্য এক অনুঘটকের প্রয়োজন। সর্বকালেই এই অনুঘটক থাকে তবে তাদের অভিমুখন হয় পৃথক। মধ্যযুগে এই প্রতিবাদের অভিমুখ খুলে দিয়েছিলেন শ্রীমহাপ্রভু। সত্য হয়েছিল সেকালের মানুষের অনুভব -

''কে যেন কহিছে মোর কানে কানে
পারের উপায় তোদের হল এতদিন
প্রেমের পসরা ধরি নিজ শিরে
প্রেমের ঠাকুর আমার এসেছে।''

ডাক চরিত্র ঃ পুথি প্রসঙ্গ

শ্যামল বেরা

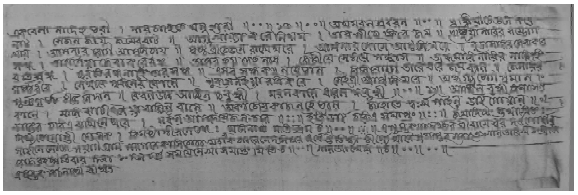

ডাক চরিত্রের পুথি খুব একটা বেশী পাওয়া যায় নি। 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ'-এ ডাক চরিত্রের একটি পুথি রয়েছে। সংগ্রহ করেছিলেন বসন্তরঞ্জন রায়। এ পুথির সংগ্রহের স্থান বাঁকুড়া জেলা। বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয় এ পুথির কয়েকটি প্রকরণ মুদ্রিত করেছিলেন তাঁর শতপুথির সংকলনে। পুথিটিতে মোট প্রকরণের সংখ্যা ১৬।

এ পুথি আসলে এক অর্থে ফ্যামিলি ম্যানুয়াল। প্রকরণের মধ্যে রয়েছে - জন্ম, ধর্ম, রন্ধন, ন্যায়, কর্জ, বসত, সু-গৃহিনী, কু-গৃহিনী, যাত্রা, মাস, বর্ষা, বলদ, কলহ, চিকিৎসা, মরণ ইত্যাদি বিষয়।

দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর 'বঙ্গভাষা পরিচয়' ১ম খন্ড (প্রকাশ কাল ১৯১৪ খ্রি.)-এ ডাকের বচনকে বৌদ্ধযুগের সাহিত্য হিসেবে আলোচনা করেছেন। রচনাকাল ধরা হয়েছে ৮ম - ১২শ শতাব্দী। এ গ্রন্থেও কয়েকটি প্রকরণ মুদ্রিত হয়েছে।

সম্প্রতি পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কোলাঘাট থানার প্রয়াগ গ্রাম থেকে ডাক চরিত্রের একটি পুথি বর্তমান প্রতিবেদক কর্তৃক সংগৃহীত হয়েছে। এ পুথিতে বেশ কয়েকটি নতুন প্রকরণ রয়েছে। পুথিটির অনুলিখনের সময় ১২৩৬ সাল অর্থাৎ ১৮৪ বছর পূর্বের। দীনেশচন্দ্র সেন, বসন্তরঞ্জন রায়-এর সংগ্রহের সঙ্গে বর্তমান সংগ্রহটিও তাৎপর্যপূর্ণ।

জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস-এর অভিধানে 'ডাক' অনুষঙ্গ সম্পর্কে লেখা হয়েছে — 'ডাক নামক জনৈক গোপ। খনার বচনের ন্যায় তাঁর রচিত এবং তাঁর ভণিতাযুক্ত অনেক বচন বা প্রবাদবাক্য প্রচলিত আছে।' দীনেশচন্দ্র সেন উপরোক্ত গ্রন্থে লিখেছেন — 'আসামের বড়পেটার ৬/৭ মাইল দক্ষিণে বার্ডসী পরগণার মধ্যে লোহ নামক একখানি গ্রাম আছে। বড়পেটার লোকেরা এই গ্রামকে 'ডাকের গ্রাম' নামে অভিহিত করিয়া থাকে। .... ডাকের জন্মস্থান বলিয়া অপর কোন গ্রাম এখনও দাবী করে নাই, তখন লোহ গ্রামকে সেই গৌরব দিতে আমাদের আপত্তি নাই। ... ডাক ও খনার বচন শুধু বঙ্গদেশে নহে, এখনও উড়িষ্যায়ও প্রচলিত আছে। ...'

বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয় তাঁর 'শতপুথির সংকলন'-এ ডাক সম্পর্কে লিখছেন - 'তন্ত্রে অনেক প্রকার সিদ্ধি আছে; তাহার মধ্যে দুই প্রকার প্রধান। বামাচারে যাঁহারা সিদ্ধ হন, তাঁহাদিগকে বীর বলে। ইঁহাদের মধ্যে যাহারা প্রধান হন তাঁহাদিগকে বীরেশ্বর বলে এবং বীরেশ্বরদের যাঁহারা প্রধান, তাঁহাদের দেশী নাম ডাক। যে সকল স্ত্রীলোক বামাচারে চরম সিদ্ধি লাভ করেন, তাঁহাদের নাম ডাকিনী। ডাকিনী-ডাকের স্ত্রী, তাহা নহে। 'ডাকিন্' 'ডাইন্' ও 'ডাইনী' শব্দ 'ডাকিনী'র-ই রূপভেদ। ডাক ও ডাকিনীগণ অলৌকিক কান্ড করিতে পারিতেন।

বৃক্ষচালনাদি ব্যাপারে, যাহা আমরা অদ্ভুত মনে করি, তাহাদের পক্ষে তাহা অতি সহজ এ সম্বন্ধে যে সকল গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের অধিকাংশই বৌদ্ধগণের লিখিত।'

প্রাপ্ত পুথির পুষ্পিকায় লিপিকার লিখেছেন — 'জথা দিষ্টং স্তথা খিতং লিক্ষ্যকো নাস্বী দোসক। ভিমস্যাপীরনে ভঙ্গঃ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম।। এ পুস্তক সা অক্ষ্যর স্ত্রী রামেস্বর দত্ত পোদ্দার সকীনে মৌজে পয়াগ গ্রাম পরগণে কাসিজোড়া মতাবক চাকলে মেদনিপুর যুবে উড়িস্যা জীল্যে থানে প্রত্তাপুর সন ১২৩৬ সাল তারিখ ১০ স্রাবন রোজ বৃহস্পতিবার দিবা ১০ দস দন্ড সময়ে লেখা সমাপ্তং মিতি। সাল আখেরি। এ পুস্তক পঠনার্থে শ্রীযুত ....

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কোলাঘাট থানার প্রয়াগ গ্রামের শ্রী রামেশ্বর দত্ত পোদ্দার পুথিটির অনুলেখন করেছেন ১২৩৬ সালে। পুথিটির মালিকের নাম নেই। আসলে, লিপিকাররা এ ধরণের পুথি লিখে রাখতেন, যিনি পুথি ক্রয় করতেন, তার নাম পরে লিখে দিতেন। এক্ষেত্রে 'এ পুস্তক পাঠনার্থে শ্রীযুত ....' লেখার পরে তাই মালিকের নামটি লেখা হয় নি।

যাইহোক, আমাদের সংস্কৃতি চর্চার পরম্পরায় এ পুথি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ পুথি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন।

শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ সর্ত্য ৪।।
শ্রী শ্রী গুরুদেব চরন স্বরনং ৪।।০০।।
ডাক চরিত্র লির্ম্ম্যতে ৪।।০০।।

জন্মমাত্র কহে ডাক ঃ

পোকে এড়ওা পুয়া রাখ।
ধুইয়্যা পুচ্ছা দিয় কোলে।।
তবে ফুল নাড়িবে ভালে।।
নাড়ি ছেদিয়া দিয়া জয়।

ডাক বলে এই সে হয়।।
যুখনা কাষ্ঠ জত্নে দেখ।
মাঝা বুঝিয়া দিয় সেঁক।।
এক কাষ্ঠ নাড়ি ঝাড়ি।
দুই কাষ্ঠে ফুঁক পাড়ি।।
তিন কাষ্ঠে করিয়া এক।
চারি কাষ্ঠে দিয়া সেক।।
দ্বিতীয় উপাসে দেয় আড়গজা।
তবে ভাল হবে পুয়াতির মাঝা।।
বিবসনা করিয়া দিয় পৈত্য।
তবে হবে পুয়াতির গত্য।।
জত্নে দুরে রাখিহ জীব।
সক্তি করিয়া ঔষধ দিব।।
ঔষধ দিয় সমান বুঝি।
ঝিটী মুল বৃহতির বিজি।।
অপরাজীতা ইসের মুল।
পাচন দিহ এই সমুল।।
পরস্পর গতি না দেখিব।
কোলের ভিতর ছায়াল থুব।।
কথা না থুব পরের বোলে।
রাত্রি হইলে সোয়াবে কোলে।।
নয় দিবসে হরিদ্রা দিহ।
একোইস দিবসে মন করিহ ।।০।।১।।

অর্থ ধর্মকরণ ।।০।।

ধর্ম্মবলে জে জন জানে।
পুখুর দিয়া পানি আনে।।
অর্স্বর্থ রূপীলে জীবন ধন্য।
মন্ডপ দিয়া অসেষ পুন্য।।
জাহা দিবে তাহা পাইয়ে।
পরলোকে তাহা খাইয়ে।।
অতিথ পুজ না বঞ্চিহ।
ব্রার্ম্ভনে উর্চ্চ না বলিহ।।
অর্ন্তধান নাহি দান।
ইহার পুর্ন্য নাহি আন।।২।।

নিরপেক্ষ

প্রণবকুমার দাস

ছেলেটা পাগল। বয়স বেশি নয়।
মাথায় ঝাঁকড়া চুল, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, মলিন বসন, পায়ে নোংরা ছেঁড়া চপ্পল।
আগে পাগল ছিল না, পড়াশোনাতেও ভালই ছিল হঠাৎই কোন এক অজ্ঞাত কারণে ছেলেটা পাগল হয়ে যায়। তবে উন্মাদ নয়।
এক এক সময় মনে হয় সে সুস্থই।

গ্রীষ্মের দুপুর
চারমাথার মোড়
প্রচন্ড দাবদাহে কাহিল অবস্থা।
হাতে একটা লাঠি নিয়ে ছেলেটা ট্রাফিক কন্ট্রোল করছে
'এই বাস এগোও এগোও, ট্যাক্সি আস্তে ডাইনে যাও, বাঁয়ে চলো, থামো রোক্‌কে'। কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই
আপনমনে সে তার কাজ করে চলেছে
দায়িত্বপ্রাপ্ত ট্রাফিক পুলিশ পাশে গাছের ছায়ায় বসে নিশ্চিন্তে সিগারেটে সুখটান দিচ্ছে।

একদিন বিকেল
পাড়ার পাশের খেলার মাঠ।
ছেলেরা তখনও খেলতে আসে নি
ওই ছেলেটা ক্রিকেট খেলার শ্যাডো প্র্যাকটিশে মত্ত
একাই বোলার, ব্যাট্‌সম্যান, ফিল্ডার, আম্পায়ার,
ছুটে এসে বল করছে - আবার উল্টোদিকে গিয়ে ব্যাট চালালো
আম্পায়ার হয়ে ওভার বাউন্ডারির সিগন্যাল
আবার বল - ব্যাট চালালো - ফিল্ডার ক্যাচ লুফলো - হাউজ দ্যাট
আম্পায়ার আউট দিলো। এভাবেই চললো কিছুক্ষণ
প্র্যাকটিশ শেষ।

ভোটের সময়
চারিদিকে রাজনৈতিক দলের পতাকা টাঙানো
সেই ছেলেটাই রেলিং থেকে তিনদলের তিনটে পতাকা খুলে নিলো - কংগ্রেসের হাত, বি.জে.পি.র পদ্মফুল, সি.পি.আই.এমের কাস্তে হাতুড়ি তারা
একদিন দেখি একাই কংগ্রেসের পতাকা হাতে নিয়ে চলেছে, মুখে শ্লোগান - জয় শ্রীরাম
খানিকক্ষণ পরে সি.পি.আই.এমের পতাকা হাতে - বন্দেমাতরম
আবার দেখি বি.জে.পি.র পতাকা নিয়ে শ্লোগান দিচ্ছে - ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ
সবাই দেখছে - কিন্তু তার কোন ভাবান্তর নেই
সে পালাক্রমে শ্লোগান দিয়ে চলেছে - জয় শ্রীরাম, বন্দেমাতরম, ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ

পাগল না নিরপেক্ষ?

তাম্রপত্র

জহর চট্টোপাধ্যায়

তখন সবে দেশ স্বাধীন হয়েছে। আমাদের এই মফস্বল শহরটা অবস্থান বদলে হয়ে গেল সীমান্ত শহর। দেশভাগের প্রভাব অবশ্য আমাদের ওপর সেরকমভাবে পরেনি, তবে কিছু যে একটা ঘটছে তা বেশ বুঝতে পারছিলাম। ব্রিটিশ শাসন শেষ হলেও আমাদের জীবনযাত্রায় কিছু কিছু সাহেবিয়ানা বেশ ভালোভাবে জড়িয়ে গিয়েছিল। ইংলিশ বেকারীর কেক, পেস্ট্রি, স্পেশাল বিস্কুট আর মিসেস মার্টির পিনাট বাটার ছাড়া তো আমার চলতো না। দুটো বেকারী বিস্কুটের মাঝে পিনাট বাটার দিয়ে স্যাণ্ডউইচ বানিয়ে খাওয়াটা ছিল আমার সব থেকে পছন্দের। এগুলো ছাড়া বাঁচার কথা কখনো ভাবতেও পারতাম না। কিন্তু ধীরে ধীরে আমরা বুঝতে পারছিলাম অবস্থা বদলাচ্ছে। ইচ্ছে না হলেও অনেক কিছু মেনে নিতে হয়। সাহেব মেম যারা ছিল তারা আগেই পথ ধরে ছিল। আধা সাহেবরাও এবার পাততাড়ি গুটোতো লাগল। আমাদের সেই ছোট্ট শহরটা থেকে অনেকগুলো রঙ হারিয়ে যেতে বসেছে এমন সময় আমাদের জন্য অনেকটা খুশী নিয়ে হাজির হলেন মাস্টার কাকা। দেশভাগের পর আমাদের এই শহরে এক দূরসম্পর্কের আত্মীয়ের কাছে এসে উঠলেন। ছোট শহর তাই খবর ছড়াতে দেরী হ'ল না। আমরা গেলাম শরণার্থী দেখতে। গিয়ে তো অবাক — আলাদা রকমের কিছু তো না। দিব্যি আর পাঁচটা মানুষের মতো।

কথাটা বললাম ঠিকই কিন্তু মাস্টার কাকা সাধারণ মানুষ ছিলেন না। তাঁর গোটা জীবনটাই ছিল আমাদের কাছে চরম বিস্ময়। বইয়ে পড়া মহাপুরুষদের জীবন যেমন হয় ঠিক তেমনই। হর জেঠু বাবার বন্ধু। মাস্টার কাকা তাঁর বাড়িতেই প্রথমে উঠেছিলেন। তিনিই আমাদের টাউন স্কুলে তাঁর একটা চাকরীর ব্যবস্থা করে দেন আর তিনি নিজেই একটা বাসার ব্যবস্থা করে নেন। মাস্টার কাকা অকৃতদার মানুষ। সঙ্গী বলতে শুধু সব সময়ের একজন কাজের লোক। মাস্টার কাকার কথা বলে শেষ হবে না। আমাদের অবশ্য আগ্রহ ছিল মাস্টার কাকার ওই কাজের লোকটিকে নিয়ে। তখন আমাদের উঠতি বয়েস, আর সে ছিল মানুষের নিষিদ্ধ গোপন গোলমেলে বিষয়গুলোর সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ ঘটিয়ে দেওয়ার অনুঘটক।

মাস্টার কাকা তাকে সাইরেন বলে ডাকতেন। মাস্টার কাকার কাছ থেকেই ওর আসল নামটা জেনেছিলাম, সুরেন। সুরেন থেকে সাইরেন নাম এসেছে আমরা এমন সহজ সমাধান করে নিয়েছিলাম। অনেক পরে অবশ্য মাস্টার কাকাই তার এই অদ্ভুত নামের রহস্য ফাঁস করেন আমাদের কাছে। রসিক মানুষ ছিলেন মাস্টার কাকা, তাই এমন নাম দিয়েছিলেন। তার কর্মচারী সুরেন প্রথম জীবনে ছিল পাকা চোর। তখন ইংরেজ আমলে লাট বেলাট থেকে সাধারণ ইংরেজ কর্মচারী সবার বাড়িতেই বিস্তর টাকা পয়সা আর দামি দামি জিনিস। সে সব হাতিয়ে ভালো ভাবেই চলে যাচ্ছিল। ধরা যে একেবারে পরেনি তা নয়। কিন্তু ধরা পরলে যে শাস্তি অপেক্ষা করে থাকত সেটাতে তার খুব ভয় ছিল। তাই খুব সাবধানে কাজ সারত। দেখতে দেখতে চুরিতে বেশ হাতযশ করে ফেলে সুরেন। মাস্টার কাকা নির্বিরোধী মানুষ, কারো সাতে পাঁচে থাকেন না। সবাই শ্রদ্ধা ভক্তি করে, সকলের সাথে খুব ভালো সম্পর্ক তাঁর। জীবন যাপনে কোনো বাহুল্য ছিল না। ঘরের আসবাবও তেমন কিছু ছিল না, আর দামি জিনিস বলতে একটা পুরোনো সুইস ঘড়ি। একরাতে শব্দ শুনে মাস্টার কাকার ঘুম ভেঙে যায়। বুঝতে পারেন ঘরে কেউ ঢুকেছে। নিজে সক্রিয় রাজনীতিতে অংশ না নিলেও বিপ্লবীদের প্রতি সমর্থন ও সহানুভূতি দুইই ছিল। পুলিশি ধর পাকড় থেকে বাঁচতে বিপ্লবীদের কেউ হয়ত ঘরে এসে লুকিয়ে রয়েছে এমনটাই ভেবেছিলেন। সেজন্য প্রথমটায় ব্যাপারটা নিয়ে না চিন্তা করলেও তার একটু অন্য রকম সন্দেহ হ'ল। 'কে ওখানে' বলে হাঁক দিতেই লোকটা 'কেউ না' বলে ওঠে। টর্চ জ্বালতেই মাস্টার কাকা দেখলেন লোকটার হাতে তার ঠাকুরদাদার ঘড়িটা। বুঝতে বাকি রইল না যে লোকটা চোর, চুরি করতে ঢুকেছে। মাস্টার কাকাকে সবাই চিনত, চোরটা ভাবল মাস্টার কাকা তাকে চিনে ফেলেছে। প্রাণে বাঁচতে সে মাস্টার কাকার হাতে ঘড়িটা ফেরত দিয়ে জোড় হাতে কাকুতি মিনতি করতে থাকে তাকে যেন পুলিশে না দেওয়া হয়। মাস্টার কাকা ছিলেন দারোগার বাড়া, সেটা চোরটা পরে বুঝতে পারে। প্রকারন্তরে তার যাবজ্জীবন হয়ে গেল। এটা অবশ্য মাস্টার কাকা ঠাট্টা করেই বলেছিলেন। মাস্টার কাকা লক্ষ্য করতেন প্রথমদিকে সুরেন তাকে ঠিক বিশ্বাস করে উঠতে পারেনি। তাকে যে সত্যি পুলিশে দেওয়া হবে না সেটা বুঝতে তার বেশ অনেকটা সময় লেগেছিল। সে সময় রাস্তায় পুলিশের গাড়ির সাইরেন শুনলেই সুরেন কোথাও একটা লুকিয়ে পরত। মাস্টার কাকা তাই মজা করে সুরেনকে সাইরেন বলে ডাকতেন।

সাইরেন আমাদের সাথে দু'দিনেই মিশে গেল। সাইরেনের হাজারো কাহিনী শোনার জন্য আমরা স্কুল ফেরতা খেলার মাঠে গিয়ে বসতাম। আমাদের টিফিনের পয়সা থেকে কিছু বাঁচিয়ে রাখতে হ'ত তার জন্য। পয়সা ছাড়া তার মুখ খোলানো যেত না। একদিন এক মেম সাহেবের কীর্তি শোনানোর জন্য সে আমাদের দু'দিনের খোরাকি আদায় করে ছেড়েছিল। ওর গল্পগুলোর সত্যি মিথ্যে যাচাই করতে মন চাইত না। সাহেবদের বাড়িতে চুরি করতে গিয়ে সে অন্দর মহলের অনেক গোপন কেচ্ছাই জেনে ফেলেছে এমনটা বিশ্বাস করতে আমাদের কোনো অসুবিধা ছিল না। অনেক সময় সাহেব মেমদের ঘনিষ্ঠ হওয়ার মুহূর্তটাকেই সে বেছে নিত নিরাপদে চুরি করার জন্য। ধরা পরার ভয় তাতে অনেক কমে যেত। এরকমই একদিন আমরা খেলার মাঠে সাইরেনের অপেক্ষায় বসে, সাইরেন এল অনেকটা দেরী করে। মাস্টার কাকার শরীর খারাপ। আমরা অপেক্ষা করছি বলে খবর দিতে এসেছে। শুনে আমরা সবাই গেলাম মাস্টার কাকার কাছে। খুব ভালোবাসত

সাইরেন মাস্টার কাকাকে। নিজের ছেলের মতো মানত, বাবার মতো স্নেহ করত। সেদিন আমরা এক মজার কথা শুনলাম। মাস্টার কাকাই শোনালেন। দেশ ভাগ হয়েছে — পূর্ব পাকিস্তান আর ভারত। হিন্দুদের এক দেশ, মুসলমানদের আর এক। মাস্টার কাকার সব ছেড়ে ছুড়ে এদেশে আসার তেমন কোনো আগ্রহ ছিল না। একা মানুষ আর মহল্লায় সবাই তাকে চেনে, মান্য করে, তাহলে আর ভয়ের কি? কিন্তু সাইরেন ভারতে চলে আসার জন্য মাস্টার কাকাকে বোঝাতে লাগল। সকাল থেকে মাদ্রাসার ছাত্রদের আনাগোনা বেড়ে গেল। তাদের কথাবার্তা আর চাহনি ঠিক অন্য দিনের মতো না। চোখের কোণায় ধূর্ততা ঝিলিক দিচ্ছে। দু'এক জনের হাতে বল্লম, সড়কিও দেখলেন। শুনলেন কলকাতায় জোর দাঙ্গা বেধে গিয়েছে। শোনামাত্র সাইরেন হাতের কাছে যা কিছু পেল পোঁটলা বাঁধতে শুরু করল। মাস্টার কাকাকে একরকম টানতে টানতে নদীর ঘাটে পৌঁছেছে তখনই মৌলবি সাহেব এগিয়ে এলেন,

— মাস্টার সাব, কই যান?

— দেশ ভাগ হ'ল, পতাকা বদলালো। তাই দেশ ছেড়ে চললাম। দেশ তো এখন আপনাদের। আমাদের তো নয়।

— এডা কি কন মাস্টার সাব! দ্যাশ তো আমাগো হক্কলের।

মৌলবি কথা বলতে বলতে দেখে মাদ্রাসার ছেলেরা কাছে চলে এসেছে। তাদের হাতে ধরাপাকিস্তানের পতাকা। সেই পতাকা দেখিয়ে মৌলবি বললেন

— দ্যাহেন, দ্যাশের পতাকায় আপনি আমি দুজনাই আসি। পতাকায় যেমন আমাগো সবুজ আসে, তেমনি আপনাদের সাদাও তো আসে। সাইরেন পতাকাটা ভালো করে দেখে মাস্টার কাকাকে সরিয়ে নিয়ে এসে বলে

— কত্তা! ওদের কথায় কান দিয়েন না। ওরা ঝাণ্ডার বাঁশখান কিন্তু সাদার মধ্যেই দিসে।

সাইরেনের এই কথা শুনে মাস্টার কাকা আর দ্বিতীয়বার ভাবেন নি। নৌকায় উঠে সোজা ভারতে চলে আসেন। সেদিন অনেকক্ষণ মাস্টার কাকার সঙ্গে কাটিয়ে বাড়ি এলাম। সাইরেনের আসল রূপটা সেদিন মাস্টার কাকার কথায় কথায় আমরা জানতে পারলাম। কি ভাবে মাস্টার কাকার সেবা যত্ন করছে। একলা মানুষটাকে সঙ্গ দিচ্ছে। মাস্টার কাকার অসুখটা আর ভালো হ'ল না। দিন দিন খারাপই হতে থাকল। শুধু সাইরেন একা লড়ে গেল সব বিপত্তির সঙ্গে। সময় এগিয়ে চলল সময়ের গতিতে, আমরাও পড়াশোনার চাপে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লাম। কলকাতায় পড়তে আসার পর তো সব কেমন স্মৃতি থেকেও আড়াল হয়ে গেল।

সিভিল সার্ভিস পাশ করে সরকারী কাজে ঢুকে পড়ার পর আত্মীয়-স্বজন-বন্ধু-বান্ধব সব যোগাযোগ না রাখতে পারার জন্য অনেক দুরের হয়ে পড়েছে। মাস্টার কাকা বা সাইরেনকে সেখানে মনে না থাকাই স্বাভাবিক। হঠাৎই একদিন সাইরেন যেন তার নামের প্রতি সুবিচার করে আমার স্মৃতির অতলে চাপা পড়ে যাওয়া একটা জীবনকে নতুন করে জাগিয়ে দিয়ে গেল। সরকার থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের তাম্রপত্র দিয়ে সম্মানিত করার ও মাসিক ভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। জেলা অফিসগুলোতে সেইমত তালিকা তৈরী করতে এবং সেইসব ব্যক্তিদের সঠিকভাবে যাচাই করতে নির্দেশ এসে পৌঁছেছে। সেইমত কাজও শুরু হয়েছে। আবেদন পত্র জমা পরছে। সরকারী লোকজন সরজমিনে যাচাই করে আবেদন মঞ্জুর করছে। এসব ক্ষেত্রে সরকারী নিয়ম মানতে গিয়ে আধিকারিকরা যাতে সম্মানীয় দেশপ্রেমিকদের অসম্মান না করে ফেলেন সে ব্যাপারটা খেয়াল রাখার জন্য আমি প্রত্যেককে আলাদা নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলাম। তাঁরাও অত্যন্ত সহৃদয়তার সঙ্গে এটা দেখেছিলেন। একটা সভা আয়োজন করে তাম্রপত্র স্বাধীনতা সংগ্রামীদের হাতে তুলে দেবার ব্যবস্থা করা হ'ল। গোল বাধল ঠিক আগের দিন রাতে। সুরেন ভক্ত নামের এক ব্যক্তিকে নিয়ে গণ্ডগোল। তার নাম নাকি তাম্রপত্রের তালিকায় ভুল করে ঢুকে গেছে। আজ একজন এসে তার নামে নালিশ জানিয়ে গেছে যে সুরেন ভক্ত একজন চোর, স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে তার কোনো কালেই সম্পর্ক ছিল না। আমি সব শুনে জানতে চাইলাম একজনের কথা শুনে তারা কেন এমন একটা সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন, তখন আমার পিওনটি বলল যে লোকটা সুরেনের নামে একথা বলেছে সেও একজন চোর। একসময় দুজনে একসঙ্গে জেল খেটেছে।

লোক পাঠিয়ে ডাকানো হল সুরেন ভক্তকে। তখনও জানিনা আমার জন্য কি চমক অপেক্ষা করে আছে। আমার অফিসের ঘরে যখন তাকে আনা হল তাকে দেখে চমকে গেলাম। এ তো সাইরেন। চেহারা ভেঙে পড়েছে। আমাকে দেখে চিনতে পারলনা। পারার কথাও নয়। সদ্য স্কুল পাশ করে কলেজে ঢোকার সময় আমাকে শেষ দেখেছে। একমুখ গোঁফ দাড়িতে আমার অন্য চেহারা। বসতে বললাম, জড়োসড়ো হয়ে বসল। বললাম আপনার নামে অভিযোগ আছে আপনি মিথ্যে বলে তাম্রপত্র আর ভাতা নেওয়ার চেষ্টা করেছেন। আপনি কোনো কালেই স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নেননি। আরো স্পষ্ট করে বললে চুরি করা আপনার পেশা ছিল। সাইরেন এটা বোধহয় স্বপ্নেও ভাবেনি, সে তো চুরি করতো বহু যুগ আগে। সে কথা এখন কে জানবে? ভাবলো সরকারী ব্যাপার স্যাপার বোধহয় এমনই হয়। এবার এক নিরুপায় বৃদ্ধ তার শেষ আকুতিটুকু আমাকে জানাল।

— বাবু আমি চুরি করতাম ঠিকই, কিন্তু সে তো শুধু ইংরেজদের বাড়িতেই। ওরা আমাদের দেশের সব কিছু লুটে নিত আর আমি ওদের লুট করা জিনিস আবার দেশেই নিয়ে আসতাম।

এমন অকপট স্বীকারোক্তির পর আমার আর কি করণীয় থাকে? সে রাতে নিজের পরিচয় গোপন রেখে সাইরেনের কাছ থেকে বহু কথা জেনে নিলাম। জানালাম মাষ্টার কাকা বেঁচে নেই। আমর বন্ধু উপেন এখন হাইস্কুলের হেডমাস্টার। সে ই সাইরেনকে সরকারী ভাতা পাওয়ার জন্য সুপারিশ করে চিঠি লিখেছে যাতে বুড়ো বয়েসে সম্মানের সাথে মৃত্যুর জন্য নিশ্চিন্তে অপেক্ষা করতে পারে। আমি সুপারিশ মঞ্জুর করলাম, কারণ হিসাবে লিখলাম আর্থিকভাবে ইংরেজদের ক্ষতিগ্রস্ত করার উদ্দেশ্যেই সুরেন ভক্ত চৌর্যবৃত্তি গ্রহণ করেছিল।

পটল্যাচ

সুমহান বন্দ্যোপাধ্যায়

পার্থদার মুখ এখনও স্পষ্ট চোখে ভাসে। দেখতে দেখতে পাঁচবছর হয়ে গেল। এখনও রবিবার সকালে কলিং বেলে দ্রুত বারবার টং টং আওয়াজ শুনলে বুকটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে — যেমন করে পার্থদা বাজাত। দরজা খুললে পর ঝটতি নির্দেশ - তাড়াতাড়ি প্যান্টটা গলিয়ে নে, ভালো ইলিশের ডিম ভাজা পাওয়া যাচ্ছে, স্টেশনের কাছে একটা স্পাইস হোটেলে। এরপর পার্থদার ইন্ডিকায় চেপে ইলিশের ডিমের ঝোল খেতে যাওয়া। কোন দিন বড় রসগোল্লার খোঁজে হানা দেওয়া কোন বিখ্যাত মিষ্টান্ন বিপণিতে।

শারীরিক নানা গোলযোগের কারণে পার্থদার খাওয়া দাওয়ায় অনেক বাধা নিষেধ ছিল। যদিও সে এসবের খুব একটা তোয়াক্কা করতো না। পার্থদা খেতে ও খাওয়াতে ভালবাসতো। আর একা একা খেতে পারতো না। পার্থদার বন্ধু বান্ধবরাও এই দাক্ষিণ্য পেত। আর কেউ কেউ পেছনে বলতো সে দিন পার্থর ঘাড় ভেঙেছি। পার্থদা যে একথা জানতো না এমন নয়। তবুও লোকজনকে খাইয়ে একটা তৃপ্তি যে পেতো এটা বুঝতে পারি। আর সেই সঙ্গে এক ধরনের প্রতিপত্তি। অন্তত সামনাসামনি রাজ্য সরকারের এই আধিকারিকটিকে তার বদান্যতার জন্য সাধুবাদ দিতে কেউ কসুর করতো না। এরই একটা অংশ আবার বলতো, পার্থ প্রচুর কামায়, কিছুটা আমাদের খাওয়ালে ক্ষতি নেই। পার্থদার উপার্জন আনুপাতিক ভাবে যথেষ্ট ছিল তা আমরাও স্বীকার করতাম।

কিন্তু এই পার্থদার কথা আমাদের আজকের কাহিনীর উপজীব্য নয়।

পার্থদার কথা মনে পড়ে গেল উত্তর আমেরিকার একটা প্রথা সম্পর্কে বলতে গিয়ে, যার নাম পটল্যাচ। পার্থদার বন্ধুরা যেমন ভাবত যে তার উপার্জিত একটা অংশের বন্টন হওয়া উচিত বন্ধুকৃত্য করতে — তেমনি পটল্যাচে বাড়তি সম্পদ বা অর্থ প্রথা অনুসারে সাধারণ মানুষের মাঝে বন্টিত হয়। বিষয়টি একটু খোলসা করে বলি।

আমাদের অর্থনীতিতে আসলে তিনটি মূল প্রক্রিয়া দেখা যায় — উৎপাদন, বন্টন আর ভোগ। খাদ্য বা ভোগ্যবস্তু উৎপাদিত হলেও তা কিন্তু ভোক্তার কাছে পৌঁছায় না। বন্টন বা বিতরণ পদ্ধতির মধ্য দিয়ে তা উপভোক্তার বা কনজিউমারের কাছে পৌঁছে যায়। আমাদের সমাজে এই বন্টনের কাজটি হয়ে থাকে মূলত বাজার ব্যবস্থার (Market System) মাধ্যমে। কিন্তু আদি বা প্রাক্‌শিল্প পর্যায়ের সমাজ থেকে শুরু করে আধুনিকতম সমাজ অবধি সর্বত্রই বন্টন হয় তিনটি উপায়ে। কার্ল পোল্যানী এই তিনটি উপায়ের উল্লেখ করেছেন, যেগুলি হল — প্রতিপ্রদান (Reciprocity), পুর্নবন্টন (Redistribution) এবং বাজার (Market exchange)। পটল্যাচ হল একধরনের পুর্নবন্টন ব্যবস্থা। তাই পুর্নবন্টন কাকে বলে তা আগে জেনে নেওয়া যেতে পারে। ক্রাপো লিখেছেন - পুর্নবন্টন হল — ' ... Contribution of commodities by all members of a group to a common pool from which they will be distributed to those who will use them.'

এখানে উৎপাদিত সামগ্রীকে কোন এক জায়গায় একত্রিত করে রাখা হয়; তারপর সেখান থেকে অন্যদের মধ্যে পুনরায় বন্টন করা হয়। রেশন ব্যবস্থা এর একটি উদাহরণ। আমাদের দেশে ধর্মগোলার যে প্রকল্প হয়েছিল, তার মূল বক্তব্য এই ছিল। করও (tax) একধরনের পুর্নবন্টন ব্যবস্থা। আমাদের দেয় কর একজায়গায় জমা হয়। সেখান থেকে তা আবার পরিষেবার মধ্য দিয়ে আমাদের মধ্যেই (করদাতা ও করদাতা নন) ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এলম্যান সার্ভিস নামে এক নৃবিজ্ঞানীর অভিমত ছিল, স্থায়ী কৃষি ব্যবস্থার সূচনা হবার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়েছিল পুর্নবন্টন। স্থায়ী কৃষিজীবী গোষ্ঠীগুলি ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে বাস করতো। এক সময়ে ভিন্ন অঞ্চলে উৎপাদিত কৃষিপণ্যের পারস্পরিক বন্টনের প্রয়োজন দেখা দিল। সেই মতো পুর্নবন্টনের শুরু। এখানে ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন দক্ষতার উপর জোর দেওয়া হয়েছিল। আর মার্ভিন হ্যারিস বললেন - দক্ষতার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হল উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে পরিমাণগত ভিন্নতা। তাই পুর্নবন্টন জরুরি হয়ে পড়ে।

কিন্তু এই একান্ত ব্যবহারিক কারণগুলির বাইরে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কিছু এমন কারণ থাকে যা পটল্যাচের মতো পুনর্বন্টন ব্যবস্থার জন্ম দেয়।

পটল্যাচ (Potlatch) শব্দটি ওয়াশিংটন ও ওরেগনে প্রচলিত চিনুক ভাষা থেকে এসেছে। এর অর্থ 'উপহার' (Gift) বা 'কিছু দেওয়া' (Give away)। এর সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞায় বলা হয়েছে —

Potlatch : A form of redistributional exchange found among many North-West Native American groups.

এটুকু বললে অবশ্য পটল্যাচ ব্যাপারটা আদতে কি তা মোটেই স্পষ্ট হয় না। সামান্য বিস্তারিত আকারে বলি। কোয়াকিউটল প্রভৃতি

জনগোষ্ঠীর মধ্যে কোন সামাজিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে গোষ্ঠীপতি বা চিফ আগত অতিথিদের প্রভূত পরিমাণে ভুরিভোজে আপ্যায়িত করেন। অতঃপর তাদের নানা প্রকার উপহার দেন। এই অতিথিদের মধ্যে সাধারণ মানুষ ছাড়াও অন্যান্য গোষ্ঠীপতিরাও থাকেন। উপহার হিসেবে দেওয়া হয় মাছ, পশুচর্ম, চাদর, অন্যান্য দামী সামগ্রী। যে গোষ্ঠীপতি এরকম যত সম্পদ বিলিয়ে দিতে পারবেন তার মর্যাদা তত বেশি। গোষ্ঠীপতিরা এজন্য নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করেন। আর মুখে বড়াই করেন তার সামর্থ্য কত বেশি তা বোঝানোর জন্য। অন্যেরা যে তার তুলনায় তুচ্ছ, বিতরণ পর্বে তাঁর ভাষণে এটি তিনি বুঝিয়ে দেন। রুথ বেনেডিক্ট এই ভাষণের কিছু কিছু অনুবাদ আমাদের সামনে হাজির করেছেন ।

'আমি সেই চিফ যাকে দেখে অন্যেরা লজ্জা পায়'

'আমি সেই একমাত্র মহাদ্রুম, আমিই প্রধান ....

আমিই সেই প্রথম ব্যক্তি যে তোমাদের সম্পদ দিয়েছে, আদিবাসীগণ'

'আগত প্রধানদের মধ্যে আমার মতো মহান আর কে আছেন তাই আমি খুঁজি

আমার মতো কাউকে আমি দেখতে পাই না।'

বেনেডিক্ট এই ধরণের ব্যক্তিদের মেগালোম্যানিয়াক বলে চিহ্নিত করেছিলেন। প্রধানমশাই তাঁর আমন্ত্রিত ব্যক্তিদের এমন উপহার দেন যে পরিমাণ তারা ফিরতি উপহারের মধ্য দিয়ে ফিরিয়ে দিতে না পারে। এমনটি করতে পারলে তবেই তার চরম আনন্দ। আসলে তাঁর সম্পদ যে কত বেশি এবং সর্বসমক্ষে সবচেয়ে সুচারুভাবে তুলে ধরাতেই তাঁর মর্যাদার পরাকাষ্ঠা নির্মিত হয়। অনেক সময় সে তার বাড়িতে আগুন লাগিয়ে ভস্মীভূত করে।

পটল্যাচ প্রথাটির ভেতরের চরিত্রটি দেখলে অনেক সময় মনে হয়, আমাদের মধ্যেই যেন পটল্যাচ চিফ একজন বাস করছেন। দান করে যে বড়াই করে বেড়ায়। বন্ধুবান্ধবের আড্ডায় কোন বন্ধু যে বিশেষ অর্থবান তা বোঝাতে খরচের বহর দেখিয়ে অন্যদের তাক লাগিয়ে দিতে চায়। মুখে যে সবসময় সে একথা জাহির করে এমন নয়।

পটল্যাচের চিফ অবশ্য জাহির করেই বলেন। সাধারণ মানুষদের যে তিনি হলেন রক্ষাকর্তা এটি বুঝিয়ে দেন। তাঁর দাক্ষিণ্য নিতে সাধারণ মানুষও অনাগ্রহী হয় না। আসলে অর্থবান বা সম্পদে গরীয়ান মানুষদের থেকে আমাদের প্রত্যাশা সামাজিক দায়বদ্ধতারই অন্যতর প্রকাশ নয় কি!

দুর্গাপুজোর চাঁদার দাবী বা জুলুমের মধ্যে বোধ হয় এই মানসিকতাই কাজ করে।

নদীর এপার-ওপার

নিমাই মান্না

নদী পার হবে বলে
ওরা কিছুজন
আঁকুপাঁকু কোরে
নদীর এপারে এসে
লাইনে দাঁড়ালো।
লাইনে দাঁড়িয়েই রইলো তারা
অনাদি-অনন্তকাল ধ'রেই
নদীর এপারেই
দুরন্ত ইচ্ছা থাকলেও
সবাই-ই পারে না যেতে
নদীর ওপারে।
লাইনেই দাঁড়িয়ে থাকো তারা
অনাদি অনন্তকাল ধ'রে
নদীর এপারে।।

বাতায়ন

শিল্পী অধিকারী

বাতায়ন মানে হোল
বাতাসের প্রতিদ্বন্দ্বী
বাতায়ন মানে হোল
কৌশল বনাম ফন্দী।
বাতায়ন মানে হোল
লজ্জার অন্তর্বাস
বাতায়ন মানে হোল
ছিন্ন কুটিরের নাশ
বাতায়ন মানে হোল
শাল সেগুনের পরিচয়
বাতায়ন মানে হোল
যুবতীর রোজগার মোহময়
বাতায়ন মানে হোল
পাঁচিল ভুক্ত অভুক্তর
বাতায়ন মানে হোল
দেহতত্ত্বের অব্যক্ত পরিচয়।

পিসা

শুভদীপ দত্তচৌধুরী

মিনার থেকে সূর্যপোড়া বিষাদ
কিনার ভোলে কখন খিদে জ্বলে,
সব হারানো ছেলেটির নাম পিসা
নুয়েই থাকে, গল্প বুনে চলে ...

সারাটি দিন দুপুরলাগা ডানা
হাওয়ায় ওড়ে পাহারাদার ফিতে,
যে যার মতো মিথ্যে গুজব বানাক
বাধ্য তো নয় সে সব মেনে নিতে

আকাশ থেকে ঝুলতে থাকা শেকল
বিপদকালীন লাইফবোটের নিশান
তেমন করেই তাহার পাশে থেকো
সব হারানো ছেলেটির নাম পিসা

একেই কি বলে শ্রীবৃদ্ধি

অলোককুমার মুখোপাধ্যায়

সাহিত্যিক বা উপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র বলা অপেক্ষা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র বলাটাই যথার্থ মনে হয়। ঋষি কে? যিনি সত্যকে দেখেন ও বলেন, তিনিই ঋষি। ঋষভঃ সত্য বচসঃ। আজ থেকে দেড়শ'বছর আগে তিনি তৎকালীন সমাজব্যবস্থার প্রতি কটাক্ষ করে বলেছিলেন — সকলেই বলিতেছে দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে .....। ছাপমারা সাম্যবাদী না হলেও তিনি সাধারণ মানুষের দারিদ্র ও কষ্টের কথা অনুভব করে জানতে চেয়েছিলেন — রামা কৈবর্ত ও হাসিম শেখের কি হইল? বস্তুত আজ ধনী লোক আরও ধনী হয়েছে।, নবজাত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষেরও কিছু ভালো হয়েছে কিন্তু মুচি মেথর কামার, সৎ ও সরল গরিব মানুষরা সেদিনও কুঁড়ে ভেঙে বেরিয়ে আসতে পারেনি আজও পারেনি। পরিবর্তন তাদের যা হয়েছে তা হল মনের পরিবর্তন। রাজনীতির দূষিত বাতাসে তাদের অনেকের সহজ সরল পবিত্র মন কুটিল জটিল ও কলঙ্কিত হয়েছে। ঘটনা যা একতরফা ছিল তা এখন দু-তরফা হয়েছে। এটুকুই হল রাজনীতিক সাম্য বা সাফল্য, পারস্পরিক সমান ঘৃণা হিংসা ও স্বার্থপরতা। ধনী ক্ষমতাবান ব্যক্তি নিরক্ষর দরিদ্রজনকে যতটা ঘৃণা ও উপেক্ষা করে, দরিদ্র অশিক্ষিতজনও সৎ জ্ঞানী ও স্বচ্ছল মানুষকে ততটাই ঘৃণা ও অমান্য করতে শিখেছে। 'মানি না, মানব না' স্লোগানও দর্শনের আওতায় এসেছে। শ্রদ্ধা ভালোবাসা ধর্মের সঙ্গেই নির্বাসিত। প্রেম এখন মন নির্ভর নয়, দেহ নির্ভর।

মত ও মতবাদের দ্বন্ধ। কোনও এক অর্থনীতিবিদের মতে দেশের আর্থনীতিক উন্নতি হলেই তার সুফল পাবে সাধারণ মানুষ, আবার অন্য এক অর্থনীতিবিদের মতে ব্যক্তির উন্নতি না হলে দেশের উন্নতি হতে পারে না। হাসিম শেখ রামা কৈবর্তর উন্নতি না হলে ট্রেন, প্লেন, রকেট, ইলেকট্রনিক্স কোন কাজেই লাগবে না।

টালি বা খড়ের চালের হাসপাতালে সাহেব ডাক্তার রাত্রে ঘুরে ঘুরে দেখতেন রোগীরা ঠিক আছে কিনা, অসুবিধা হচ্ছে কিনা। তখন সাজ সরঞ্জামের প্রাচুর্য ছিল না। চিকিৎসাবিজ্ঞান ও ব্যবস্থা আজকের মতো উন্নত ছিল না, কিন্তু ডাক্তার নার্সের মনে সেবাভাব থাকত, ভালোবাসা ছিল; আজ রোগী যন্ত্রণায় কাতর হয়ে ডাক্তার নার্সকে খুঁজে বেড়ায়, তাদের হদিস পায় না, পেলেও কপালে তিরস্কার জোটে।

আজ মানুষের আয় বেড়েছে কিন্তু ব্যয় যা বেড়েছে বহুগুণ বেশি, তা অকল্পনীয়। বিস্ময়করও বটে। বড় সফল ব্যবসায়ী নয়, সরকারী বা বেসরকারী বড় চাকুরের মাসিক বেতন এক থেকে দু' লক্ষ টাকা হলেও রামা কৈবর্ত, হাসিম শেখরা জননেতাদের বা দাদাদের নজরানা দিয়ে সারা দিন খেটে একশ টাকা পায় তাও রোজ নয়। তাই ধনী ও দরিদ্রের ব্যবধান কমেনি বরং বেড়েছে। সেদিনের জিনিসপত্রের দামের তালিকা দেখলে অবাক হতে হয়। কোলকাতা ও বাংলার কথাই ধরা যাক।

ইংরেজ কোম্পানি বাগবাজার থেকে কালীঘাট এর মধ্যে তিনটি গ্রাম কিনেছিল মাত্র ১৬০০ টাকায়। এখন সেই তিনটি গ্রামের এমন কোনও অংশ নেই যেখানে মাত্র এক কাঠা জমির দাম আট বা দশ লাখ টাকার কম হবে।

দুর্গাপুজো উপলক্ষে এই লেখা তাই দুর্গাপুজোর খরচের কথা বলি যা শুনে পাঠক অবাক হবেন।

১৭৮১ সালে কাটোয়ার জনার্দন শর্মা বা ধনবান শর্মা তাঁর বাড়ির পুজোয় খরচ করেন মোট আশি টাকা, তখন ১৭ মণ চাল মিলত মাত্র ৬ টাকা ৪ আনায় (২৫ পয়সা) আর দেড় মণ সরষের তেল মিলত মাত্র ২ টাকায়।

১৮৩০ সালে পটলডাঙ্গার রাধানাথ বসুমল্লিক বাড়ির দুর্গাপুজোয় খরচ করেন ৯৭৬ টাকা - চালের দর ছিল টাকায় এক মণ চার সের।

১৮২৩ সালে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'কলিকাতা কমনালয়ে' জিনিসপত্রের দরদাম প্রকাশ করেন। এক মণ ভালো চালের দাম চোদ্দ আনা আর মোটা চাল দশ আনা মণ। ডালের দামও দশ আনা মণ, এক মণ ঘি পাওয়া যেত চার টাকা চোদ্দ আনায়। লবণের দর এক মণ মাত্র বারো আনা আর চিনির দর পাঁচ টাকা দশ আনা মণ।

১৮৬৪ সালে সোনার দাম ১০ টাকা ভরি; ১৮৮০ সালে তার দাম ১৪ টাকা। শ্রীরামকৃষ্ণের সময় যখন (১৮৮০) তাঁর বেতন ৫ টাকা থেকে ৭ টাকা হয় তখন তিনটি জামার দাম ১ টাকা ২ আনা, ভালো ধুতি ১৫ আনা আর মোটা একটি তেলধুতির দাম ছিল ৬আনা ২ পয়সা। একটা শাড়ির দাম ১ টাকা ৭ আনা, একজোড়া জুতোও ঐ দামে মিলত। একটা ভালো গামছার দাম ৩ আনা ২ পয়সা, ১ টাকায় একটা ছাতা মিলত। এক মণ আতপ চালের দাম ১ টাকা ৪ আনা, একসের মিছরির দাম ৭ আনা ও একসের সাবুর দর ৪ আনা।

আরও পরে ১৯৩৫ সালে অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে টাকায় চারটি মোটা কাপড় মিলত। ভালো দিশি ধুতির দাম ২ টাকা, জোড়া বিলিতি ধুতির দাম ১ টাকা ১২ আনা, শাড়ির দাম ২ টাকা, হাওড়া হাটে পাঁচটি ব্লাউজ বিক্রি হত ১ টাকায়, গামছার দর ৬ পয়সা।

দুধের দাম টাকায় ৮ সের, কাটা পোনা বা মাংস ৬ আনা সের। ১০ আনা সের ঘি, আর ২ আনা সের চিনি ও সরিষার তেল।

তখন সবে পাইস হোটেল চালু হয়, ১ পয়সায় ভরপেট ভাত ডাল সব্জি ও চাটনি মিলত। মাছ নিলে আরও ১ পয়সা। বেতনের হিসাবও অধ্যাপক অতুল সুর দিয়েছেন। সরকারী অফিসে বেয়ারার বেতন ৬ টাকা, গ্র্যাজুয়েট কেরানি পেত ২৫ টাকা আর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের বেতন ৮০ টাকা তবে বিলেতী আই.সি.এস. পেত ২৫০ টাকা।

১৯৪৩ সালে দুর্ভিক্ষের আগেও চালের মণ ছিল ৩ টাকা, ১৯৫২/৫৪ সালেও চিনির দর এক টাকা সের, কাটা পোনা বা মাংস মিলত আড়াই টাকা সের দরে। চাল ডালের দরে ১০ বা ১২ আনা সের। ১০ গ্রাম সোনার দাম ১০০ টাকার মতো। বড়রা বলতেন যুদ্ধের জন্য দাম বেড়েগেছে।

এখন যুদ্ধ নেই শ্মশানের শান্তি। বিদেশী বণিক নেই কিন্তু দেশী ব্যবসায়ী আছে। কালোবাজারি আছে কারণ তাদের ল্যাম্পপোষ্টে ঝোলাবার কথা নেতারা ভুলে গিয়েছিলেন ক্ষমতা হাতে পাবার পরই। ক্ষমতা হাতে পেতে ও রাখতে ঐ সব অসাধু ব্যবসায়ীদেরও হাতে রাখতে হয়। আধুনিক রাজনীতিতে সিক্ত অর্থনীতি তেমনই বলে।

দেশের শ্রীবৃদ্ধি না হলেও জিনিষের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে, মানুষের মূল্য কমেছে। জীবনধারণের মান বেড়েছে কারণ অর্থনীতির ভাষায় মাথা পিছু আয় বেড়েছে অঙ্কের হিসাবে। টাটার আয় দু' কোটি আর চাষার ব্যাটার আয় দু'শ টাকা। অতএব পার ক্যাপিটা আয় হল (টাকায়) এক কোটি একশ টাকা। অঙ্কের জাদু। চোখে পড়ার মত শ্রীবৃদ্ধি ঠেলাওলা রিক্সাওলার হাতে মুঠোফোন, বাদাম বিক্রেতার বাড়িতে টি.ভি. এসেছে। চোর ডাকাত যাদের পি.সি. বা জে.সি.তে থাকার কথা তারা এ.সি. ঘরে থাকছে। পরিবর্তন এসেছে। কিছু রামা হাসিম হয়ত অসাধু হয়ে ধনবান হয়েছে আর তর্করত্ন, বিদ্যারত্ন সাধুত্ব বজায় রাখতে গিয়ে ভিখারী হয়েছে। অনামীজন মানী সাংসদ হয়েছে আর মানীজন তাদের সেবক হয়েছে, প্রোটোকল মেনে।

এরই নাম পোস্ত

অমলেন্দু চট্টোপাধ্যায়

গ্রীনল্যান্ড ফিনল্যান্ড যতবারই যাস্ তো,
বাজি রাখ হেরে যাবো যদি এটা পাস্ তো
তুই সেথা পাবি না'কো এ নামের গাছ তো
এরই নাম পোস্ত এটা শুধু বাঙালীর
পাতে দিলে মনে হয় খায় ঠেসে কাঙালীর।
নামটা তো বললাম এটা তুই খাস্তো
না খেলে জেনে রাখ পড়ে যাবে লাশ্তো
ভয় পেয়ে বুক দুরু গলা ছেড়ে কাশ্তো
এরই নাম পোস্ত এটা নয় ভোলবার
সবায়ের জিভে জল মন করে তোলপাড়।
কড়াই এর ডাল দিয়ে পুচু ভালবাস্তো
এত ভাত সাঁটতো যে মা চড় ঠাস্তো
সবে বলে থাম বাবা পেট হবে ব্যস্ত
এরই নাম পোস্ত এ যে চিরদিন বাঁচাবে
তরকারী হয়ে শুধু মনটাকে নাচাবে।
রুনুর মা'র কাছে যদি তুই চাস্তো
একগাদা পাতে দেবে পালাবি যে ত্রস্ত
কানমুলে তবু তুই টান্বি না রাশ্তো
জেনে রাখ পোস্ত যুগ যুগ বাঁচবে
আনন্দে হাসিমুখে বাঙালিরই থাকবে।

বর মাগি

বিনয়শংকর চক্রবর্তী

প্রভু অসীম করুণা আধারে
ছড়ায়ে আশিস জগৎ মাঝারে
অনল অনিল নিরাকার সাকারে
অণু হ'তে পরমাণু চারিধারে।
প্রভু প্রণতি চরণে দাস ছেলে
দাওনি দীন অধমে দূরে ফেলে
মানুষ গড়ার বীজমন্ত্র ঢেলে
অমানুষে দাও নাই দূরে ঠেলে ফেলে।
প্রভু তব করুণার তুলনা নাই
কবি স্বীকৃতি আসন লভি তাই
স্বপনেও দীনে সাধ জাগে নাই
বামন হয়ে চাঁদে উঠিব ভাই।
প্রভু যশ খ্যাতি অনিত্য ধরায়
কভু না দীনে প্রাণ মন ভরায়
সাধ তব দীনে চরণ ছোঁয়ায়
স্মৃতি হ'য়ে রহিতে বর জোগায়।

না চিনে

চন্দ্রাদিত্য চন্দ্র

তোমার সাথে চলে এসেছি
অনেকখানি পথ
এবার তুমি থামো বারেক
থামাও তোমার রথ।
যখন তোমার হাত ধরেছি
সূর্য ছিল ঢাকা
কুজ্ঝটিকা সরে গেছে
চাহনি যেন বাঁকা।
সাগর পাড়ে এসে গেছি
এবার তুমি থামো
বোঝাপড়া হয়ে যাক
মাটিতে এসে নামো।
ভিন দেশে কেউ নেই
সঙ্গী কাকে পাবো
ভালো করে চিনে নিই
তবেই সঙ্গে যাবো।
এ কি কান্ড সুখ নেই
সবই তোমার মুখোশ
এইখানেই শেষ হল
তোমার সঙ্গে আপস।

বেতার জগৎ — এক লুপ্ত সংস্কৃতি

প্রদীপকুমার ভট্টাচার্য

''আকাশবাণী কলকাতা, খবর পড়ছি.....।'' একথা বোধহয় অনেকেরই জানা আছে এই আকাশবাণী কলকাতার জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল ১৯২৭ সালের ২৬শে আগষ্ট, ডালহৌসি পাড়ার ১নং গারস্টিন প্লেসের একটি বাড়ী থেকে। 'আকাশবাণী' নামটি অবশ্য ঠিক তখনই ছিল না। নামটি এসেছে অনেক পরে, রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার পরিপ্রেক্ষিতে। কবিতাটি খুব চেনা কবিতা, 'অল ইন্ডিয়া রেডিও' কে উদ্দেশ করে লেখা —

'' ধরার আঙিনা হতে ঐ শোনো
উঠিল আকাশবাণী।
অমরলোকের মহিমা দিল যে
মর্ত্যলোকেরে আনি। .....''

যদিও কবিতাটি লেখা হয়েছিলো ১৯৩৮ সালে, তার অনেক পরে ১৯৫৭ সালের ১লা এপ্রিল স্থায়ীভাবে 'আকাশবাণী' নামটি 'অল ইন্ডিয়া রেডিও'র স্থলাভিসিক্ত হয়। 'স্থায়ীভাবে' বলার কারণ, স্বাধীনতা পরবর্তী যুগে কলকাতা বেতারের বিশেষ কিছু অনুষ্ঠানের শুরুতে 'আকাশবাণী কলকাতা' কথাটি ঘোষণা করা হতো।

যাইহোক, 'আকাশবাণী কলকাতা'র ইতিহাস বর্ণনা এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য আজকের ছেলেমেয়েদের একটি বিশেষ পত্রিকার ব্যাপারে অবহিত করা। পত্রিকাটির নাম 'বেতার জগৎ'। ৫০ বছরেরও বেশী সময় ধরে মাসে দু'বার করে নিয়মিত প্রকাশিত হওয়া পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায় '৮০ দশকের মাঝামাঝি নাগাদ। যদিও পত্রিকাটির মূল লক্ষ্য ছিল বেতারের অনুষ্ঠানসূচী শ্রোতাদের আগাম জানানো, কিন্তু ওই অনুষ্ঠানসূচী ছাড়াও রেডিওতে প্রচারিত হওয়া বিশেষ কথিকা এবং গল্প, সাক্ষাৎকার, কবিতা, বেতারসংক্রান্ত বিভিন্ন খবর ইত্যাদিও প্রকাশ করা হতো। বহু বাঙ্গালী বাড়ীতেই পত্রিকাটি নিয়মিত রাখা হতো, বিশেষতঃ যেসব বাড়ীতে রেডিওর নানাধরণের বৈচিত্রমূলক অনুষ্ঠান শোনার রেওয়াজ ছিলো। প্রসঙ্গতঃ বলে রাখা ভালো, বাংলায় পত্রিকাটির নাম 'বেতার জগৎ' হলেও, দিল্লী থেকে অনুরূপ একটি ইংরাজী ভাষায় বার হতো, যার নাম ছিল 'আকাশবাণী'। 'জয়বাবা ফেলুনাথ' ছবিতে এই 'আকাশবাণী' পত্রিকার অনুষ্ঠানসূচী দেখে ফেলুদা নিশ্চিত হয় বিকাশ সিংহ তাকে মিথ্যা কথা বলেছে, যা গণেশমূর্ত্তি চুরির রহস্যভেদে একটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র ছিলো।

১৯২৭ সালের ২৬শে আগষ্ট যখন কলকাতা বেতারের সম্প্রচার শুরু হলো, তখন এ ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা যাঁর ছিলো, তিনি হলেন নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার। এঁর আর এক পরিচয় ইনি ছিলেন একজন বিখ্যাত ক্ল্যারিওনেট বাদক। কলকাতা বেতার কেন্দ্রকে কি করে সাধারণ শ্রোতার কাছে জনপ্রিয় করে তোলা যায়, সে ব্যাপারে তাঁর চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। তাঁর মাথাতেই এই ভাবনা প্রথম আসে যে, বেতারে কখন কার কি অনুষ্ঠান থাকবে, তা যদি শ্রোতাদেরকে আগে থেকেই জানিয়ে দেওয়া যায় তবে তাতে তারা খুব উপকৃত হবে। প্রথম থেকেই নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়ের লক্ষ্য ছিল কলকাতা বেতারের অনুষ্ঠানসূচীকে আকর্ষণীয় করার জন্য অনুষ্ঠানে বৈচিত্র্য আনা। নিজে একজন সঙ্গীতসাধক হবার খাতিরে বিভিন্ন সংগীতশিল্পীকে রেডিওতে আমন্ত্রণ জানাতে তাই তাঁর কোন অসুবিধা হয়নি। সেই সময় স্বনামধন্য নলিনীকান্ত সরকার মহাশয় বিভিন্ন জলসায় এবং রেকর্ডেও কৌতুকগীতি পরিবেশন করে বেশ নামধাম করেছেন। নৃপেন্দ্রনাথ আমন্ত্রণ করে নিয়ে এলেন নলিনীকান্তকেও। রফা হলো নলিনীকান্ত বেতারে সংগীত পরিবেশন করেন সপ্তাহে একদিন, দশটাকার সম্মানদক্ষিণায় অর্থাৎ মাসে চল্লিশ টাকা। কয়েকমাস এভাবে গান গাইবার পর নৃপেন্দ্রনাথ, সরকার মহাশয়কে রেডিওতে চাকরির প্রস্তাব দিলেন। মাসিক পঞ্চাশটাকার মাহিনায় নলিনীকান্ত পেলেন রেডিওর 'প্রোপাগান্ডা' করার কাজ। খুব সুকৌশলে, যাতে সম্পাদকরা বুঝতে না পারেন যে আসলে এটি একটি 'বিজ্ঞাপন' দেওয়া হচ্ছে, এইভাবে বিভিন্ন পত্রিকায় নলিনীকান্ত রেডিওর নানা অনুষ্ঠানের আলোচনা করতে লাগলেন, অবশ্যই ছদ্মনামে — কারণ

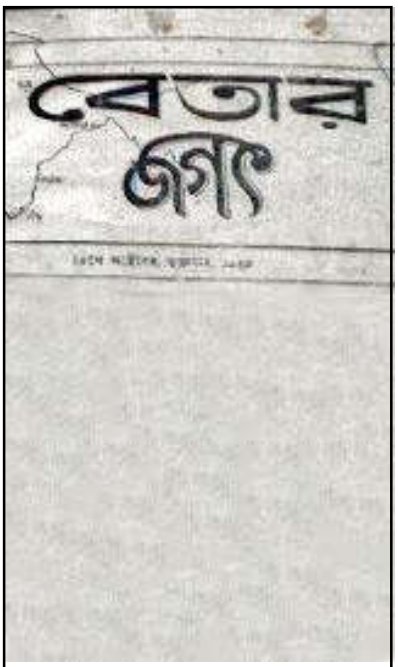

তখনকার বেতার জগতের প্রচ্ছদ

তিনি প্রতিষ্ঠানের বেতনভুক কর্মচারী। এইসব প্রোপাগান্ডা সেই সময় বহু বিদগ্ধ শ্রোতার মনে যথেষ্ট প্রভাব ফেলতে সমর্থ হয়েছিলো। ছদ্মনামে লেখা এমনই এক বেতার আলোচনা পড়ে স্বয়ং নজরুল ইসলাম 'নবশক্তি' পত্রিকার সম্পাদককে লেখা একটি চিঠিতে ছদ্মনামী লেখককে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন। এইভাবে রেডিওর অনুষ্ঠান ক্রমশঃ জনপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকাটাই 'বেতার জগৎ' প্রকাশের প্রাক্ কারণ।

'অল ইন্ডিয়া রেডিও'র সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে থাকা বিখ্যাত সাহিত্যিক 'মহাস্থাবির' প্রেমাঙ্কুর আতর্থী এক স্মৃতিকথায় লিখছেন — '' সে সময় কলকাতা বেতার কেন্দ্রের ডিরেকটার ছিলেন মিঃ স্টেপল্টন। কিছুদিন বাদে স্টেপল্টন সাহেব ও তাঁর সহকর্মীগণ এক পরিকল্পনা করলেন, বেতারের বাঙালি শ্রোতাদের সুবিধার্থে কলকাতা কেন্দ্রের অনুষ্ঠানসূচী প্রতিপক্ষে বাংলায় প্রকাশের জন্য একটি পাক্ষিক পত্রিকা বের করার। ওই পাক্ষিক পত্রিকায় বেতার বিষয়ক কিঞ্চিৎ তথ্য ও খবর এবং বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান সম্পর্কে কিছু কিছু টিপ্পনীমূলক আলোচনা প্রকাশের ব্যবস্থাও থাকবে — স্থির হলো। যতদূর মনে পড়ে 'রেডিও ওয়ার্ল্ড' কথাটির বাংলা নামকরণ করে 'বেতার জগৎ' পত্রিকাটির নাম স্থিরীকৃত হলো।'' এই প্রসঙ্গে বলি 'বেতার জগৎ' নামটি বীরেন রায় মহাশয় এর দেওয়া, যিনি ছিলেন সেইসময় বেহালার জমিদার তনয়, যিনি প্রথম থেকেই কেবলমাত্র নিজের শখে ও অবশ্যই পারিশ্রমিক না নিয়ে বেতার ঘোষক হিসাবে ও সংবাদ পাঠক হিসাবে কাজ করেছিলেন।

যাই হোক অনুষ্ঠানসূচী জানানোর জন্য পত্রিকা প্রকাশের সিদ্ধান্ত যখন পাকা হলো, নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার আহ্বান জানালেন প্রেমাঙ্কুর আতর্থীকে পত্রিকাটি সম্পাদনা করার জন্য। আতর্থী মহাশয়ের সম্পাদনায় আর এক সাহিত্যিক মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রেস থেকে 'বেতার জগৎ' এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশ হলো ১৯২৯ এর ২৭শে সেপ্টেম্বর। পত্রিকার দাম ঠিক হলো এক আনা। মজার ব্যাপার হলো, আসল সম্পাদনার কাজটি প্রেমাঙ্কুরবাব করলেও সম্পাদক হিসাবে নাম ছাপা হলো নৃপেন্দ্রনাথের। পরবর্তীকালে ও ভারতের স্বাধীনতা লাভের আগে পর্যন্ত নিয়ম হলো স্টেশন ডিরেক্টরের নাম ছাপতে হবে। সেই অনুযায়ী 'বেতার জগৎ' এর সম্পাদক হিসাবে জে. আর. স্টেপল্টনের নামই প্রকাশ পেতো। প্রথাটি অবলুপ্ত হয় ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টের পর; কারণ এরপর 'বেতার জগৎ'এ প্রকৃত সম্পাদক যাঁরা হতেন তাদেরই নাম প্রকাশ করা হতো।

এর মধ্যে একটা ব্যাপার ঘটল। কলকাতা কেন্দ্র থেকে যে বেতারের অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হতো, তার পিছনে ছিল একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান — 'ইন্ডিয়ান ব্রডকাষ্টিং কোম্পানী'। ৩০ এর দশকের শুরুতেই এই বেসরকারী প্রতিষ্ঠানটি বেশ অর্থসঙ্কটের মধ্যে পড়ে। কর্তৃপক্ষ ভিতর ভিতর সিদ্ধান্ত নেয় সম্প্রচার বন্ধ করে দেবার। কিন্তু গত আড়াই বছরে বেতার অনুষ্ঠান শ্রোতাদের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে, আর কানাকানির মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত তাদের জানাজানি হয়ে গেছে। ফলে শ্রোতাদের প্রতিবাদ চিঠির মাধ্যমে বেতার জগৎ এর পাতায় আছড়ে পড়ল। সেই কারণেই কিনা জানা নেই, বেতার সম্প্রচার চালু রইল। দায়িত্বভার গ্রহণ করল খোদ সরকার। ১৯৩০ সালের ১লা এপ্রিল থেকে পরীক্ষামূলকভাবে ভারত সরকার বেতার সম্প্রচার শুরু করল। 'ইন্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কোম্পানী' নাম পালটে হল 'ইন্ডিয়ান স্টেট ব্রডকাষ্টিং সার্ভিস'।

পরবর্তীকালে প্রেমাঙ্কুর আতর্থী সিনেমা জগতের সঙ্গে জড়িয়ে পড়লে 'বেতার জগৎ' সম্পাদনার দায়িত্ব পড়ে নলিনীকান্ত সরকারের উপর। সেই থেকে তাঁর অবসর নেওয়া পর্যন্ত (১৯৪৪ এর সেপ্টেম্বর মাস) উনি সুচারুভাবে সেই দায়িত্ব পালন করেন।

উদ্বোধন হবার দিন থেকে ১৫ দিন অন্তর 'বেতার জগৎ' প্রথমদিকে প্রতি শুক্রবার বার হতো। কিন্তু ১৯৩০ সালের ১লা মার্চ থেকে এর প্রকাশনার দিনটি পাল্টে গিয়ে হয় শনিবার। সেই থেকে প্রতিমাসের ১ তারিখে ও ১৫ তারিখে বেতার জগৎ প্রকাশিত হতে থাকে। ১ লা তারিখের পত্রিকাতে থাকত প্রথম পনের দিনের বেতার অনুষ্ঠানসূচী ও ১৬ তারিখের পত্রিকাতে জায়গা পেত পরবর্তী ১৫ দিনের অর্থাৎ মাসের শেষদিন পর্যন্ত অনুষ্ঠানসূচী। এই প্রসঙ্গে বলে রাখি, ১৯৩৬ সালের ৮ই জুন থেকে 'ইন্ডিয়ান স্টেট ব্রডকাষ্টিং সার্ভিস' পরিচিত হয় 'অল ইন্ডিয়া রেডিও' নামে। এই সময় পর্যন্ত ভারতে তিনটি স্থানে বেতার কেন্দ্র ছিল — বোম্বাই বা বর্তমান মুম্বাই, কলকাতা ও দিল্লী। বোম্বাই থেকে বেতারের অনুষ্ঠানসূচী সম্বলিত অনুরূপ প্রকাশিত ছিল ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত 'ইন্ডিয়ান রেডিও টাইমস্', যা পরবর্তীকালে নাম পাল্টে হয় 'দ্য ইন্ডিয়ান লিস্নার (The Indian Listener)'। তেমনি দিল্লী থেকে বার হতো হিন্দী ও উর্দু ভাষার প্রকাশনা 'আওয়াজ'; ১৯৩৮ সালের জুলাই মাসে হিন্দী 'আওয়াজ' পত্রিকার নাম পাল্টে গিয়ে হয় 'সারং'। ১৯৫৮ সালের জানুয়ারী মাস থেকে অবশ্য হিন্দী ও ইংরাজী দুটি মুখপত্ররই নাম হয় 'আকাশবাণী'। 'বেতার জগৎ' এর নাম কিন্তু প্রথম থেকে শেষপর্যন্ত অপরিবর্তিতই থেকেছে।

কলকাতা বেতার কেন্দ্র ১৯৫৮ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর থেকে গার্স্টিন প্লেস থেকে উঠে আসে তার বর্তমান ঠিকানায় 'আকাশবাণী ভবন'-এ কিন্তু 'বেতার জগৎ' এর অফিস এই ঠিকানায় স্থানান্তরিত হয় ১৯৬০ সালের মাঝামাঝি নাগাদ। আমার ছোটবেলায় আমাদের বাড়ীতে নিয়মিত 'বেতার জগৎ' আসত। আমার এক জ্যাঠামশাই ছিলেন রেডিও ও বেতার জগৎ-এর এক উৎসাহী শ্রোতা ও পাঠক। এর পাতাগুলি ছিল যথেষ্ঠ ভালো মানের এবং মুদ্রণও ছিল ঝরঝরে।

'বেতার জগৎ' এ যে শুধুমাত্র বেতারের অনুষ্ঠানসূচীই ছাপা হতো তাই নয়, আগেই বলেছি, এখানে অন্যান্য লেখাও প্রকাশিত হতো। মহাশ্বেতা দেবীর বিখ্যাত উপন্যাস 'অরণ্যের অধিকার' এখানেই ধারাবাহিক ভাবে বার হয়েছিল। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়দের মতো প্রথিতযশা সাহিত্যিক বা নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শক্তি চট্টোপাধ্যায়এর মতো স্বনামধন্য কবিদের লেখাও এর পাতা আলো করেছে। 'বেতার জগৎ'এর শারদীয়া সংখ্যাও বার হতো এবং কমদামের শারদ পত্রিকা হিসাবে এটি ছিল যথেষ্ট আকর্ষণীয়। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল, নরেন্দ্রনাথ মিত্র বা সমরেশ বসুর মতো লেখকের লেখা এত সামান্য মূল্যে সংগ্রহ করতে পেরে পাঠকেরা রীতিমতো খুশি হতেন। তবে আমার মতে সাময়িক পত্রিকা হিসাবে 'বেতার জগৎ'এর গুরুত্ব ছিল অন্যত্র। আকাশবাণী, কলকাতায় বিভিন্ন গুণী মানুষদের নানা ব্যাপারে বক্তব্য কথিকার আকারে যেমন আজও পাঠ করা হয়, তেমনটা আগেও ছিল। স্বভাবতঃই ক্যাসেট রেকর্ডারে তাদের বন্দী না করা হলে তা সম্প্রচারের পরই হাওয়ায় মিলিয়ে যেতো। 'বেতার জগৎ' এ এইসব কথিকা বাছাই করে ছাপানো হত, যা মনস্বী পাঠকের কাছে ছিল অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়াও বেতার জগতে প্রকাশিত হতো স্বরলিপি সহ বিভিন্ন গান, বেতারশিল্পীদের সাদাকালো আলোকচিত্র, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার, রেডিও নাটক সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আলোকচিত্র ইত্যাদি।

নিবন্ধের শুরুতেই রবীন্দ্রনাথের লেখা যে কবিতাটির কথা বলেছি, তা বার হয়েছিল এই 'বেতার জগৎ'-এরই পাতায়, ১৯৩৮ সালের আগষ্ট মাসে। নলিনীকান্ত সরকারের অনুরোধে কবি এই কবিতাটি রচনা করেছিলেন শান্তিনিকেতনে বসে। মোট ১৬ লাইনের কবিতা, যাতে বেতার সম্প্রচারের ভাবটি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে কাজেই 'অল ইন্ডিয়া রেডিও' যে অন্যতর ভাবে 'আকাশবাণী' নামটি কবিতাটি থেকে ধার নিয়ে সেই নামেই পরিচিত হয়ে উঠবে, সেটাই স্বাভাবিক। ১৯৭৫ সালের আগষ্ট মাসে কলকাতা দূরদর্শন তার নিয়মিত সম্প্রচার শুরু করে। বছর দশেকের মধ্যেই ধীরে ধীরে রেডিও তার আগেকার আকর্ষণ হারিয়ে দূরদর্শনকে তার জমি ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। বিশেষতঃ শহরাঞ্চলে গৃহস্থবাড়িতে নির্দিষ্ট কিছু সময় ছাড়া রেডিও শোনার পাঠ উঠেই যেতে থাকে। স্বাভাবিক ভাবেই 'বেতার জগৎ' পত্রিকাতেও তার ছায়া পড়ে। নানা কারণে এর প্রচারসংখ্যা হ্রাস পেতে পেতে দিল্লীর কর্তাব্যক্তিদের নির্দেশে ১৯৮৬ সালে যবনিকা পতন হয় পত্রিকাটির। আর এখন এই উনত্রিশবছর পরে সে আজ পরিণত হয়েছে ইতিহাসে।

তথ্যসূত্র ঃ কোরক পত্রিকার 'আকাশবাণী' সংখ্যা ও স্মৃতি

অহংকার

লিপিকা দাস

তুমি সুন্দর
তুমি জ্ঞানী
তুমি বুদ্ধিমান
এককথায় তুমি সর্বগুণের অধিকারী
আর আমি? ঠিক তোমার বিপরীত
জানি, হ্যাঁ আমি জানি
তাই তুমি আমায় করুণা করো
দেখাও দয়া
অনুভব করি আমাকে তাচ্ছিল্য করো
করো অবহেলা
এতেই তোমার সুখ
তোমার অহংকার এটাই
কিন্তু আমার অহংকারও
তোমার থেকে
কোন অংশে কম নয়
আজ আমি কুৎসিত বলেই
তুমি সুন্দর
না হলে কে গুরুত্ব দিতো
তোমার সৌন্দর্যকে?
আমি নির্বোধ বলেই
তুমি বুদ্ধিদীপ্ত
কার চোখ ধাঁধাঁতে
বুদ্ধির দীপ্তিতে?
আমার কল্পনা দৈন্য
তাই তুমি কবি
কে শুনতো তোমার কাব্যের কচকচানি?
হ্যাঁ, আমার অহংকার এই যে
তোমার অহংকারের
স্রষ্টা আমি।

'জেলার খবর সমীক্ষা'র গ্রাহক হন
বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ৪৫ টাকা
লেখা পাঠান, মনোনীত হলে তা প্রকাশ করা হবে। পত্রিকা সম্পর্কে আপনার মূল্যবান মতামত জানান।
যোগাযোগ করুন — সম্পাদকীয় দপ্তরে, গ্রাম ও পোঃ - অমরাগড়ী, জয়পুর, হাওড়া। ফোন - ৯৮০০২৮৬১৪৮

রাণি রাসমণির বাড়ির দুর্গাপুজো

তাপস বাগ

আকাশের নীলে, কাশের সাদায়, শিউলির সুঘ্রাণে খুশির সুর। হিমালয় নন্দিনী উমা এসেছেন বাপের বাড়ি। শারদীয় স্ফূর্তির মেজাজ মেগা থিমের সর্বজনীন থেকে ঠাকুরবাড়ির আটপৌরে অন্দরমহলেও। মধ্য কলকাতার বনেদি বাড়ির পুজোগুলির মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য রাণি রাসমণি বাড়ির দুর্গাপুজো। ঐতিহ্য আর সাবেকিয়ানায় আজও অমলিন। রাণিমার দুই বাড়ির দুর্গাপুজো কেমন ছিল, আর এখন কেমন আলোচনা করা যাক।

১৩, রাণি রাসমণি রোড। মধ্য কলকাতার ঐতিহ্যমন্ডিত বনেদি বাড়ির পুজো। রাণি রাসমণির পুজো নামে এলাকায় সুবিদিত। শাক্তমতে এ বাড়ির পুজো হয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র, সত্যজিৎ রায়, বসন্ত চৌধুরী থেকে মহানায়ক উত্তমকুমারের মতো কিংবদন্তিদের আবির্ভাব হয়েছে এ বাড়ির পুজোয়। ১৭৯১ সালে রাণি রাসমণির শ্বশুরমশাই প্রীতিরাম দাস এ পুজোর সূচনা করেন। বংশপরম্পরায় যা আজও হয়ে চলেছে। রাণিমা পুজোর দায়িত্ব গ্রহণের পর পুজোর আড়ম্বর আরও বেড়ে যায়। উল্লেখ্য রাণি রাসমণির আগ্রহে বিদ্যাসাগর মহাশয় এই ঠাকুরদালানে বিধবা বিবাহ উপলক্ষে পঙ্‌তিভোজন করাতেন। অতীতে এ বাড়ির পুজোয় মহিষ বলি দেওয়া হত। তবে বর্তমানে পশুবলি প্রথা বন্ধ। পুজোতে অন্নভোগ না হলেও লুচি, মিষ্টি নানা ধরণের ফলমূল সহযোগে ভোগ সকল অতিথিদের বিতরণ করা হয়। নাপিতরা নৈবেদ্য সাজায়, ফল কাটে। এদের বলে বাশভরি। থাকে পরিবারের নিজস্ব হাতে তৈরী বিশেষ ধরণের গজা, খাজা, প্যাঁড়া, নারকেল নাড়ু ও অন্যান্য মিষ্টান্ন। জাঁকজমক আগের মতো না থাকলেও পরিবারের সদস্যদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে পুজো হয়ে ওঠে অনন্য। রাণিমার ঠাকুরদালানের দরজা সকল ভক্তদের জন্য উন্মুক্ত।

১৮, রাণি রাসমণি রোড। রাণি রাসমণির অপর একটি বাড়ি। তিনতলা দৃষ্টিনন্দন ভবনটিতে দেবীপুজোর সূচনা করেন রাণিমার জামাই মথুরামোহন বিশ্বাসের (সেজবাবু) পৌত্র নৃত্যগোপাল বিশ্বাস। চারপুরুষ পেরিয়ে আজও একই ভাবে দেবী পুজো হয়ে চলেছে। মার্টিনবার্ন কোম্পানির তৈরী চওড়া দালান ও সুবিশাল থাম সম্বলিত কারুকার্যময় বনেদি বাড়ি। একচালা ডাকের সাজের সাবেকি দেবীমূর্তি। পুজোর চারদিনই হোম, আরতি, চন্ডীপাঠ ও ভোগ বিতরণ নিষ্ঠা সহকারে হয়। স্বর্গীয় নৃত্যগোপাল বিশ্বাসের প্রপৌত্র সুদীপ্ত বিশ্বাস বললেন, অতীতের ঐতিহ্য মেনে এখনও এ বাড়িতে কুমারীপুজোর প্রথা আছে। ছাগবলি প্রথা চালু রয়েছে। আগে মোষ বলি দেওয়া হত। নবমীর দিন আখ ও চালকুমড়ো বলি হয়। বংশের পূর্বপুরুষরা নীলকণ্ঠ পাখি ওড়াতেন বলে জানা যায়। এ বাড়ির ঠাকুরদালানে অতীতে জমজমাট পালাগানের আসর বসত। আসতেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের মহারাজরা। প্রাচীন প্রথা অনুসারে বিসর্জনের দিন দশপ্রহরণধারিণীকে কাঁধে করে গঙ্গার ঘাটে নিয়ে গিয়ে নিরঞ্জন করা হয়।

উল্লিখিত দুই বাড়ি ছাড়াও কলকাতা জুড়ে রাণি রাসমণির আরও কয়েকটি বাড়ি রয়েছে। সেই বাড়িগুলিতেও প্রথা অনুযায়ী দুর্গাপুজোর চল রয়েছে।

M/S Techno Fabricating Concern

Shanpur Bhagwan Das Math, P.O.- Dasnagar, Howrah-711105

Manufacturing of Impeller, Ducting, Casing, Chassis, Floor Plate, Gear Box etc.

Contact with -- Radha Raman Hazra & Kamalesh kumar Manna

Ph. - (033) 2667-6926

আড্ডার একাল ও সেকাল

পল্টু ভট্টাচার্য

আড্ডা বাঙালীর কাছে সাত রাজার ধন এক মানিক। দুর্গা পুজো এলেই আমরা সেই মানিকের সন্ধানে হন্যে হয়ে ঘুরি। পাড়ার মন্ডপ, চায়ের দোকান, রক থেকে কলকাতার কফি হাউস একেবারে ম ম করে। বাঙালী তথা কলকাতার আড্ডা সারা বিশ্বে বন্দিত। কারণ সব কীর্তিমানেরা জানেন যে তাঁদের সকল সৃষ্টির মূল হল আড্ডা। চিত্র পরিচালক শ্যাম বেনেগাল তো বলেন যে কোন নতুন ছবি শুরুর আগে তাঁর মাসখানেক কলকাতার কফি হাউসে আড্ডা মারা চাই-ই চাই। একথা অনস্বীকার্য যে ভালভাবে বাঁচতে গেলে অক্সিজেন নয়, চাই নির্ভেজাল আড্ডা।

সেই রূপচাঁদ পক্ষীর আমল থেকেই আড্ডার পথ চলা শুরু। কত গান, কবিতা, নাটক, হাফ আখড়াই, রসগীতি, তরজা উঠে এল বাঙালীর জীবনে। তৎকালীন জমিদার বা ধনাঢ্য ব্যক্তিদের বৈঠকখানায় নিয়ম করে সকাল ও সন্ধ্যেয় আড্ডা বসতো। বন্ধুত্ব বিনিময়, সংস্কৃতি চর্চা, পরোপকারিতা, পারিবারিক যোগাযোগ সব কিছুই ঘটত এই আড্ডায়।

আমি সাঁত্রাগাছি গ্রামের যুগপুরুষ বাবু কেদারনাথ ভট্টাচার্যের বংশধর। আমাদের জ্যেঠামশায় সোমনাথ ভট্টাচার্য মহাশয় 'সে যুগের আড্ডা' শীর্ষক প্রবন্ধে আমাদের ভট্টাচার্য পরিবার ও সাঁত্রাগাছি গ্রামের আড্ডার সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। আমি তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমার দেখা ও শোনা সাবেক আড্ডার বিবরণ দিতে উদ্যোগী।

কেদারনাথ ছিলেন মিশুকে মানুষ। তাঁর হাওড়া ও কলকাতার বাড়িতে নিয়মিত আড্ডা হতো। এমন কি আড্ডা শেষে মাঝরাতে বন্ধুবান্ধবরা খাওয়াদাওয়া করে বাড়ি ফিরতেন। উমাকান্ত লাহিড়ি চৌধুরী ছিলেন চৌধুরী বাড়ির জামাই। হাওড়ায় এলে কেদারনাথের আড্ডায় যোগ দিতেন। উমাকান্তের অনুরোধে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র সতীশ লাহিড়িকে কেদারনাথ নিজ সংসারে সন্তানের তুল্য প্রতিপালন করেন। তাই আড্ডার মহানুভবতা কি অস্বীকার করা যায়!

কেদারনাথের কনিষ্ঠ পুত্র গোপালচন্দ্র (আমার প্রপিতামহ) বেশ মজলিশি লোক ছিলেন। তাঁর বৈঠকখানায় সপ্তাহান্তে গানবাজনার আসর বসত। নিজে তবলা বাদক ও গান বাজনার সমঝদার ছিলেন। গায়ক বাদকরা ছাড়া সুরেন গাঙ্গুলী (বেতড়), হেম সান্যাল (বেঁড়ের বাগান) নিয়মিত আসতেন ও আড্ডা দিতেন। এই বিষয়ে স্মরণীয় যে হেম সান্যাল মহাশয় এই অঞ্চলে আড্ডা দেওয়ার রেকর্ড স্থাপন করেন। কারণ গ্রামের একপ্রান্তে বেঁড়ের বাগানে তাঁর বাড়ি, পথিমধ্যে দু'চারটি কেরোসিন বাতি, জনবসতি কম তবু হেমবাবু আড্ডা দিয়ে গভীর রাতে বাড়ি ফিরতেন। ছোট বড় সকলের সঙ্গে ছিল তাঁর সমান ও গভীর বন্ধুত্ব। চৌধুরী পাড়ায় মহাবীর লাহিড়ীর বাড়ি বৈকালিক আড্ডা ছিল নামকরা। এই আড্ডায় আসতেন কাঙ্গালীচরণ খাঁ, মহেন্দ্র মৈত্র (নংটিবাবু), ইন্দু চৌধুরী, হাবু চৌধুরী, সতীশ চন্দ্র, রাধিকাপ্রসাদ ভাদুড়ী (প্রসাদদা)। এঁদের মধ্যে কয়েকজন ছিলেন নিঃসন্তান। তাই এই আড্ডাটিকে বলা হতো ''আঁটবুড়ো এ্যাসোসিয়েশন''। সে সময় এই আড্ডা ছিল ব্রাহ্মণ প্রধান গ্রামের সমাজপতিদের বৈঠক ও পাড়ার পার্লামেন্ট এবং এই আড্ডায় যাবতীয় সংবাদ সংগৃহীত এবং আলোচনা অন্তে মতামত প্রকাশ করা হতো। সতীশচন্দ্র অসুস্থ হলে নলীন্দ্রনাথ কর (বেতড়ের কর পরিবার / ছেনিদা) গিরীশ চৌধুরী (চৌধুরীপাড়া), উপেন পাল (পালপাড়া) প্রভৃতি ধনাঢ্য ব্যক্তিরা তাঁর বাড়িতে আড্ডা দিতেন। দফায় দফায় চা, মুড়ি, লুচি, বাটিচচ্চড়ির আগমন ঘটত। এই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি প্রসঙ্গে সতীশবাবু ও ছেনি করের বাকযুদ্ধ আজকের দিনে টিভির প্রতিপক্ষ বিতর্ককেও ছাপিয়ে যেত, আর সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতো গৃহভৃত্য দীনো। বর্তমান সাঁত্রাগাছি পাবলিক লাইব্রেরীর পূর্বদিকে দেবেন বাউলের ভিটে বাড়ি। মোহিতচন্দ্র ভট্টাচার্যের বাড়ি ডাক্তারখানা হয়ে যাওয়ায় সমগ্র আড্ডা এই বাউল বাড়িতে বসত। তাস খেলা ও গল্পগুজব দুইই চলত। আড্ডাধারীরা হলেন দেবেন বাউল, অভয় ভট্টাচার্য, শরৎ চৌধুরী, শিরিষ কুন্ডু, হেম সান্যাল, উপেন ঢোল, হারান শেঠ প্রভৃতি। একদিন আড্ডায় এসে একজন বল্লেন ভাই আজ একটা ভাল প্রবন্ধ পড়লাম কিন্তু প্রবন্ধটির নামের অর্থ বোধগম্য হলো না কারণ সেন্ধ বলবন নাম কখনও শুনিনি। মোহিতচন্দ্র বলে উঠলেন 'ওরে হনুমান ওটা সৈন্ধ বলবন নয়, ওটা পড়বি সৈন্ধব

আড্ডা এখনও উঠে যায়নি। বি.কে.পাল স্কুলের ১৯৪২ সালের ম্যাট্রিক পাশ করা ছাত্ররা এখনও মাসে একবার করে সমবেত হন নিজেদের মধ্যে আড্ডায় - তারই পুরনো এক ছবি

লবণ, তবে বুঝতে পারবি,' হাসির ফোয়ারায় আড্ডায় যেন সুনামি ঘটে গেল। ঐ বাড়িতেই তাস বা পাশা চলত তীব্র লড়াই এর মধ্যে, 'দুয়ো' 'দুয়ো' চিৎকার এমন কি চৌকির পায়া ভেঙে দু'একবার বিপদও ডেকে এনেছিল। শিশিরকুমার আর অমরেন্দ্রনাথের বাড়ির চাতালে (আমার ঠাকুর্দা) আড্ডা শুধু আড্ডাই হতো।

কালের যাত্রায় ঐসব আড্ডাস্থল আজ বিলীন। কোথাও ফ্ল্যাট, কোথাও গুদামঘর, কোথাও বা বেদখল। সেই আড্ডাস্থলকে বক্ষে ধরে আছি। আসলে পাঠকবর্গ ব্যাপারটা কি জানেন আড্ডায় মানুষে মানুষে মেলবন্ধন ঘটত। সমাজটা ছিল একজোট হয়ে সব মানুষের পাশে দাঁড়াবার জন্যে। আজ নেট বা ই-মেলে এন্টার টিপে মানুষে মানুষে যোগাযোগ হয় কিন্তু কোন অন্তরঙ্গতা হয় না। আপনাদের কাছে আড্ডাধারীদের নাম বা পদবী অপরিচিত কিন্তু বিশ্বাস করুন ঐ সব পরিবারের মানুষজন আজ দেশ বিদেশের মর্যাদাপূর্ণ পদে প্রতিষ্ঠিত। কারণ তাদের শুরুটা যে পারিবারিক মেলবন্ধনের মধ্যে ঘটেছে তাতে তারা শিক্ষা, ব্যবসা, বিদেশযাত্রা মায় জীবনে নামীদামী হওয়ার রসদ পেয়েছে। তাই বাঙালীর সেই আড্ডা ফিরে আসুক। কারণ আড্ডায় দু'জনের তর্কযুদ্ধের রুপ মনে করায় গোল্ডস্মিথের — *'Village School Master'* এর বর্ণনাকে

'In arguing, too, the person owned his skill
For even though vanquished he would still
With words of learned length and thundering sound
Amazed the gazing rustics flocked around'

যুগের হাওয়া

মালতী দাস

শুন শুন সর্বজন শুন দিয়া মন,
এ যুগের কিছু কথা করি নিবেদন।
এ যুগেতে ঘরে ঘরে সকলেরই গ্যাস,
সহজেই রান্না হয়ে যায় ব্যস।
মাইক্রোওভেন, ইনডাকশান বলে একসাথে,
প্রয়োজনে লাগি মোরা দিও রেখে হাতে।
রান্নার তেলে ঘরে ধরে না কো চিট
যদি ভাই চিমনিটা করে দাও ফিট।
ব্যস্ততা কাটাতে যদি হতে চাও ফ্রি যে,
রান্নাবান্না করে তবে পুরে দাও ফ্রিজে।
রুটি মেকারে আজ গড়া হয় রুটি
মিক্সি দিয়েছে ভাই বাটনাতে ছুটি
জামাকাপড় কাঁচা হয় ওয়াশিং মেশিনে,
খেয়েদেয়ে ধোয় হাত নক্সার বেসিনে।
থালা বাসন মাজা আজ হয় নাকো হাতে,
সে মেশিনও রেডি ভাই এদিক সামলাতে।
ভ্যাকুয়াম ক্লিনার দিয়ে হয় ঘর ঝাড়া,
ঝাঁটা তাই পেয়ে গেছে অনেকটা ছাড়া।
গরমেতে ছট্‌ফট্ এসে গেছে এ.সি.
ঘর রাখে ঠান্ডা চাই কি আর বেশি
চিঠি দিয়ে কেউ কারো করে নাকো খোঁজ
মোবাইল হাতে হয় যোগাযোগ রোজ
ল্যাপটপ কম্পিউটার সেরা এক সৃষ্টি
ভোজনের শেষে যেন পাত ভরা মিষ্টি।

শিশু শিক্ষা

শ্রেয়শ্রী সিন্‌হা

ঘোড়া পিটিয়ে গাধা
সবাই করতে পারে,
গাধা পিটিয়ে ঘোড়া —
হয় কই ঘরে ঘরে?
সব ঘরেতে — সব শিক্ষালয়ে
চাবুক ঠ্যাঙানি বেশ চলে
শেখাবার কর্তাদের বিরক্তি
অধৈর্য দেখি পলে পলে।
যাদের অধ্যবসায় সহিষ্ণুতা নেই
তারা কি বিশ্বাস স্থাপন করে —
বাচ্ছার সুদৃঢ় ভিতই গড়বে
ফাঁকিবাজিতে কি সব হয়
নিজেরা জানি বুঝি শিখেছি কি
বাচ্ছারা সেই আধার থেকে পাবে কি
ভালবাসা ছাড়া বলো দেবো কি
রক্ষতা — হিংস্রতায় অমানুষই গড়ে
এসব ভাবনাই বড়দের ভাবাক আজ
শিশু মানুষ করার পদ্ধতি জানুক
নিজেদের বদলে সে দিশায় হোক কাজ।
কালো রঙে চোবালে সবই কালো হয়
অপদার্থরা নিরাশ হলে ভয়ংকর অতিশয়
মানুষই মানুষ গড়ে জানোয়ার-পশু কি পারে?
সত্য বাস্তব এটা বোঝা চাই নিশ্চয়।

মহামারীর নাম ডিমেনসিয়া

ডাঃ গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়

রোজকার অভ্যাসের মতো আজ সকালেও বাজারের ঝুলিটি নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন রমেনবাবু। নিত্য প্রয়োজনীয় সব্জী আনাজপাতি নেওয়ার পরও একটু তাজা শাক আর গ্রামের পুকুরের চুনো মাছ খুঁজতে একটু দেরীই হয়ে গেল তাঁর। ফেরার তাড়া ছিল, তবু বাড়ির পথে হাঁটতে হাঁটতে রমেন ভটচাযের মনে হ'ল, আজ যেন একটু বেশিই সময় লাগছে। রাস্তার পাশের বাড়িঘর দোকানপাট গুলোকেও কেমন অচেনা অচেনা ঠেকল তাঁর, তবে কি বাজারের পিছনের দিকের উল্টো পথে চলে এসেছেন তিনি?

পথ ঠিক করতে গিয়ে আরও বাড়ে ধন্ধ, এ তল্লাটের দীর্ঘদিনের বাসিন্দা রমেনবাবু, কিন্তু নতুন নতুন ফ্ল্যাটবাড়ির আলোছায়ায় কেমন সব গুলিয়ে যেতে থাকে তাঁর। ঘুরতে ঘুরতে পা টন্‌টন্‌ করে, হাতের বাজারের ব্যাগ ভারী ঠেকে, রাস্তার ধারের একটা গোলমোহর গাছের ছায়ায় বসেই পড়েন রমেনবাবু। এমন ভুল তাঁর কখনও হয়নি, ইদানিং লোকের নাম ভুলতেন, অনেক সময় যত্নে রাখা কাগজপত্র খুঁজে পেতেও অসুবিধা হত, তা বলে বাড়ির রাস্তা বেমালুম ভুলে যাওয়া? সেদিন সন্ধ্যায় রমেনবাবুকে উদ্‌ ভ্রান্ত, হতভম্ব অবস্থায় উদ্ধার করল শর্মিলি, রমেনবাবুর পুত্রবধূ, খোঁজ পাওয়া গেল এক রিক্সাচালকের কাছ থেকে। বাইরে বেরনো বন্ধ হয়ে গেল রমেনবাবুর এরপর থেকে কিন্তু সত্যিই তাঁর কি হয়েছিল?

শুরুর দিকে খেয়াল না করলেও এমন এক একটা ঘটনা কিন্তু অনেক কিছুই হঠাৎ ঘটে যায়। হয়ত এমন কিছু কিছু ভুল আগেই হয়ে চলেছিল রমেনবাবুর, কে জানে বয়সের ভ্রম ভেবে উড়িয়েই দিয়েছিলেন কি না! জেদ বশত মোবাইল ফোন ব্যবহার করতেন না, কারো সাহায্য নিতেও ঘোরতর আপত্তি ছিল তাঁর, আর স্বাধীনতা হারাতেও কঠোরভাবে নারাজ ছিলেন তিনি।

চিকিৎসকের কাছে যেতে জানা গেল, 'ডিমেনসিয়া' হয়েছে রমেনবাবুর, সম্ভবতঃ অ্যালঝাইমার রোগ থেকেই এই স্মৃতি লোপ ও ডিমেনসিয়া। ঠিক বোঝা গেলো না'তো? লাতিন শব্দ 'ডিমেনসিয়া' অনেক পুরনো কথা, যার অর্থ মন অথবা চিত্ত-ই উধাও হয়েছে যেখানে। ভাষা ব্যবহারের দক্ষতা, শব্দ নির্বাচন, নিতান্ত সাধারণ দৈনন্দিন কাজকর্মের ধাপগুলিও কেমন যেন গুলিয়ে যায় এখানে। চেনা লোকের নাম মনে করতে না পারা, চেনা পরিবেশও অচেনা ঠেকা, পরিকল্পনা মাফিক কোনও কাজ শুরু করতে অসুবিধা এমনটাও হয়। অথচ কাউকে বলতে লজ্জা, সংকোচ, কিন্তু ভেতরে বাড়ে উৎকণ্ঠা, বারবার ভুল থেকে তৈরী হওয়া সংকোচ মানুষকে গুটিয়ে দেয় ভেতর ভেতর। রোগ যতই গভীর হয়, পরিবর্তন হয় আচার আচরণে, ব্যক্তিত্বে, ক্রমে মানুষটা কেমন শিশুর মতো নির্ভরশীল হয়ে পড়েন অন্যদের উপর। স্মৃতি কাজ না করলে পদে পদে বিপদ — ব্যাঙ্ক, পেনশন, পোষ্টঅফিস এসব তো দূরের কথা ওষুধ খেয়েছি কিনা, সকালের জলখাবার খেলাম কি, দাঁত মাজা হয়েছে তো, এসবেও সমস্যা দেখা যায়। ক্রমে মানুষটি নিজের বাইরের খোলসটুকু মাত্র, চূড়ান্ত নির্ভরশীল, অবিন্যস্ত, একা, নিজেকেই কোথাও যেন হারিয়ে ফেলেছেন।

নির্ভরশীল হয়ে পড়ার ভয়, সম্মানহানির ভয়, অবসাদ সবকিছু গ্রাস করে মন-কে এসময়, কিভাবে 'ডিমেনসিয়া' শব্দটাকে উড়িয়ে দেওয়া যাবে? ভারতবর্ষ আজ 'এজিং নেশন' দেশের জনসংখ্যার একটা বড় অংশ এখন সত্তর, আশি ছাড়িয়ে চলেছে আর ডিমেনসিয়া মূলতঃ বয়স্ক মানুষেরই অসুখ, তাই ঈশান কোণের ওই সিঁদুরে মেঘটা ক্রমেই ভয় দেখাচ্ছে আমাদের।

অনেক কারণেই হতে পারে ডিমেনসিয়া বা চিত্তভ্রংশী রোগটি। সেরিব্রাল স্ট্রোকের পর, পারকিনসন রোগ থেকে, আরো কিছু স্নায়ুঘটিত অসুখে ডিমেনসিয়া এলেও সব চাইতে নীরবে আর গভীর ভাবে আসে অ্যালঝাইমার বর্ণিত রোগ থেকে ডিমেনসিয়া। প্রতি একশ'জন ডিমেনসিয়া রোগীর অন্তঃত সত্তর জন-ই কিন্তু অ্যালঝাইমার রোগের রোগী।

কথা নেই, বার্তা নেই, এসে গেল অ্যালঝাইমার, প্রথমদিকে বুঝতে পারলে ভাল, কিন্তু ক'জন বোঝেন, বুঝলেও এড়িয়ে যান বিশেরভাগ মানুষ। তাই রোগনির্ণয় আর রোগলক্ষণ প্রকাশের মাঝখানে নষ্ট হয় মূল্যবান দু'আড়াই বছর, ততদিনে বেশ চোখে পড়ার মতন সমস্যায় ভুগছেন মানুষগুলি।

আজ থেকে প্রায় এক শতাব্দীরও কিছু সময় আগে ১৯০৬ সালে জার্মানির চিকিৎসক ডাঃ অ্যালোইস অ্যালঝাইমার নির্ণয় করেন রোগটি, তাঁর নামেই নাম হয়েছে তাই। এইসব রোগীদের পোষ্টমর্টেম মস্তিষ্ক পরীক্ষায় অ্যালঝাইনার সহেব দেখেছিলেন মানব মস্তিষ্কের অগ্রভাগের ফ্রন্টাল লোব আর পার্শ্বস্থ প্যারাইটাল লোব কিভাবে ক্ষয়ে গেছে। বন্ধু প্যাথলজিস্ট ফ্রাঞ্জ নিস্‌লের সহায়তায় অণুবীক্ষণের নীচে দেখেছিলেন 'সেনাইল প্লাক' আর 'নিউরোফিব্রিলারী জট'। আরো পরে জানা গেল মস্তিষ্কের অ্যাসিটিল কোলিন স্নায়ুরাসায়নিক পূর্ণ স্নায়ুকোষগুলির ভূমিকা, অ্যামাইলয়েড প্রোটিনের অস্বাভাবিক সঞ্চয় কিভাবে বিপদ ডেকে আনে, কিভাবে তৈরি হয় মৃত স্নায়ুকোষের

অ্যাক্সন অংশ, ডেনড্রাইটস্ কিম্বা গ্লায়া কোষের সমাহারে তৈরী হওয়া 'প্লাক' এর কথা, টাউ প্রোটিন থেকে বিটা প্লিটেড সিট সব জানলাম আমরা।

এইসব তথ্যরাজিকে কাজে লাগিয়ে আজ চিকিৎসার পথও তৈরী হচ্ছে। আজ আমরা জেনেছি পঁয়ষট্টি বছর বয়সের পর থেকে এ রোগের সম্ভাবনা বাড়ে, পঁচাশি বছর বয়সের পর এই সম্ভাবনা সর্বাধিক। বংশগত কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা গেল, ভাইবোন কিম্বা বাবা মায়ের মধ্যে অ্যালঝাইমার রোগ থাকলে সম্ভাবনা বাড়ে। যমজ ভাই বোনের পরীক্ষায় কিম্বা ক্রোমোজোমের বিশ্লেষণেও এর প্রমাণ মিলেছে। পুরুষ ও নারীর রোগ সম্ভাবনার অনুপাতে মেয়েদের দিকে পাল্লা সামান্য ভারী, হয়ত নারী পুরুষের চেয়ে দীর্ঘ জীবনে অধিকারিণী বলেই এমন হয়।

বেশ কিছু শারীরিক রোগ যেমন, ডায়াবিটিস মেলিটাস, থাইরয়েড গ্রন্থির অসুখ, উচ্চরক্তচাপ, অধিক ওজন, রক্তে অতিরিক্ত কোলেস্টেরলের উপস্থিতি অ্যালঝাইমার রোগের সম্ভাবনা বাড়ায়। দীর্ঘস্থায়ী মানসিক চাপ, মানসিক অবসাদ এবং মদ্যপানের অভ্যাসও এমন সম্ভাবনা বৃদ্ধিতেই সাহায্য করে। মস্তিষ্কে স্ট্রোকের পর যেমন ভাস্কুলার ডিমেনসিয়া বাড়ে, তেমনই বাড়তে পারে অ্যালঝাইমারের সম্ভাবনা, যেমনটা বারবার মস্তিষ্কের আঘাত থেকেও আসে। কোলেস্টেরল এবং হোমোসিস্টিনের পরিমাণ শরীরে বাড়াটাও রোগের পক্ষে বেশ খারাপ, আর তাই অধিক ক্যালরি এবং অধিক ফ্যাটযুক্ত খাবার অ্যালঝাইমারের বিপদ ডেকে আনতে পারে।

অন্যদিকে কম ক্যালরি ও কম ফ্যাট যুক্ত খাদ্য, মাছের তেল, শাকসব্জী, ফল এ রোগ ঠেকিয়ে রাখতে পারে। টমাটো, গাজর ভিটামিন-সি, -ই কিম্বা ফোলেট বা বি-টুয়েল্‌ভ সমৃদ্ধ খাবার এক্ষেত্রে উপকারী।

অ্যালঝাইমার রোগের সম্ভাবনা কমাতে সক্রিয় জীবনযাত্রার ভূমিকা অনেক। হাল্কা ব্যায়াম, নিয়মিত হাঁটা যথেষ্ট কার্যকরী, এটাও সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে। কেবল খাদ্য খাবার বা হাঁটাচলাই নয়, মাথা র কাজ বন্ধ করা যাবে না। শব্দ ভাবতে হবে, 'শব্দ জব্দ' করতে হবে, সামাজিক কথাবার্তা থেকে দূরে সরে যাওয়াও যাবে না। মানুষে মানুষে যোগাযোগ হ'ল মস্ত বড়ো সংযোগ সেতু, বিনোদনও তাই, এতে কেবল আত্মমূল্যই বাড়ে না, বৌদ্ধিক ক্ষমতার অবনমন ও রোধ করা যায় অনেকটা।

যত তাড়াতাড়ি রোগটি নির্ণীত হয়, চিকিৎসার ফলও ভাল সেখানে। কাছের মানুষদেরও তাই বুঝতে হবে, বারবার একই কথা বলা, ছোট ছোট দৈনন্দিন ঘটনার ভুল, ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার বোধ কমে যাওয়া, জিনিসপত্র হারিয়ে ফেলা, এমনকি কারো উপর অত্যন্ত নির্ভরশীল হয়ে পড়াও কিন্তু ডিমেনসিয়ার প্রাথমিক লক্ষণ হতে পারে। বয়সোচিত সব ভুল - ভ্রান্তিই যদিও ডিমেনসিয়া বা অ্যালঝাইমার রোগ নয়, তবু এক্ষেত্রে রজ্জুতে সর্পভ্রম ভাল।

সারা পৃথিবীতেই ডিমেনসিয়া রোগ বাড়ছে, আমাদের দেশও এর ব্যতিক্রম নয়। চিকিৎসা, ঔ যধ দিয়ে এবং ওষুধবিহীন উভয়ই আছে। অনুরোধ কেবল, বয়স হলে অমন হবেই অথবা এ সব নিছক পাগলামি ভেবে ডিমেনসিয়া-র মতন মহামারীর সম্ভাবনা ত্বরান্বিত করবেন না। আমাদের বয়স্ক অভিভাবকদের জন্য এটুকু কি আমরা করতে পারি না?

রিক্ততার অনুভব

কাকলি মুখার্জী

তুমি নিশ্চিত জেনেও ছুটেছিলাম তোমাকে থামাতে।
অন্তরের অন্তস্থলের প্রচন্ড শক্তি দিয়ে চেয়েছিলাম তোমাকে বাধা দিতে।
কত মন্দিরে মন্দিরে মাথা ঠুকেছি, দ্বিধা দ্বন্দ্বের দোলায় দুলেছি।
মহাশক্তির আরাধনা করেছি কত শুক্লাতিথিতে।
আমার সবটুকু নিঃশেষ করে মাতৃত্বের বন্ধনকে
অটুট রাখতে চেয়েছি প্রতি পলে পলে। কিন্তু পারিনি।
আমার মনের গভীর ক্ষতকে অগ্রাহ্য করে, আমার স্তব্ধতাকে বিদ্রুপ করে,
কেড়ে নিয়েছ আমারই মনের মণিকোঠায় গেঁথে রাখা সবার সেরা সেই মুক্তটাকে
তোমার শক্তির কাছে আমি পরাজিত হয়েছি।
এ মহাশূন্যের নক্ষত্রের আলোক মাঝে।
আমারই সর্বশ্রেষ্ঠ অলংকারকে আকাশ প্রদীপ হয়ে জ্বলতে দেখেছি
আর সেই রিক্ততার অনুভবে ক্ষতবিক্ষত হয়েছি বারংবার।
তাই তুমি সার্থক, তুমি নিশ্চিত, তুমি বাস্তব, তুমি-ই মৃত্যু।।

বেঁচেই বাঁচা

প্রণব ভট্টাচার্য্য

বেঁচে আছি সুরে, কবিতায়, চলায়
বেঁচে থাকা ঘেমে যাওয়ায়, জেগে ওঠায়
বেঁচে আছি অনেক শব্দে, হাঁপিয়ে ওঠায়
বেঁচে থাকা স্বপ্ন নেশায়, আমায় মাতায়।
কান্না আছে, নিরর্থক পকেটও আছে,
বেঁচে থাকার প্রেরণা আছে।
তুমি আছো, কোথায় তুমি? তবু বাঁচব
অনেক বাজলো, তবু জাগব, আজই বাঁচব।
কটাক্ষ আছে, ভ্যাক্যান্সি নেই
বিরক্তি আছে, বন্ধু নেই।
অট্টহাসি ! তবুও আছি
লড়াইয়ে, আহ্লাদে, প্রাণে, প্রেমে, আজই বাঁচব
বেলা বাড়লো, তবু জাগব, রোজই বাঁচব।

ধন্ধাঙ্ক

শাশ্বত দাস

অঙ্ক নিয়ে ভীতি অনেকেরই আছে কিন্তু একটু ভাল করে বোঝার চেষ্টা করলেই বোঝা যায় যে অঙ্কের মধ্যেও অনেক মজা লুকিয়ে Õ±Ëä¼Â üý×æ±õÂ üõþ÷æ±ýù ÕË Âõ¤õ±î Âý×ñ±+ অঙ্ক = ধন্ধাঙ্ক। এখানে সেই মজারই কিছু অঙ্ক নিয়ে নাড়াচাড়া করে দেখা যাক সত্যিই অঙ্ক শক্ত কি না।

নিজের পছন্দের সংখ্যা খোঁজা ঃ

প্রথমে নিজের পছন্দের যে কোন একটা সংখ্যা মনে মনে ভেবে নিন, তারপর তাকে ৩ দিয়ে গুণ করে ১ যোগ করুন, যা হল তাকে আবার ৩ দিয়ে গুণ করে মনে ভেবে রাখা সংখ্যাটা যোগ করুন। যোগফলে যে সংখ্যাটা এল দেখে নিন তার এককের অঙ্ক ৩ কি না। যদি মিলে থাকে তাহলে সেটা কেটে দিন। বাকি যা বেমালুম পড়ে আছে দেখে নিন সেটাই আপনার মনে মনে ভাবা সংখ্যা।

হাতে কলমে করে দেখা যাক — ধরা যাক আপনি ভেবে ছিলেন ১৭, একে ৩ দিয়ে গুণ করলে দাঁড়ায় ৫১ তারপর ১ যোগ করলে হয় ৫২. একে যদি ৩ দিয়ে গুণ করা যায় তাহলে দাঁড়াছে ৫২ X ৩ = ১৫৬ এর সঙ্গে ১৭ যোগ করলে হচ্ছে ১৫৬ + ১৭ = ১৭৩। এককের অঙ্কে ৩ আছে সেটি বাদ দিলে যা পড়ে রইল সেটাই আপনার মনে মনে ভেবে রাখা সংখ্যা ১৭। কি মিলল তো!

অদ্ভুত সংখ্যা ঃ তিন অঙ্কের এমন একটি সংখ্যা বের করতে হবে যা থেকে ৭ বিয়োগ করলে এবং সেই বিয়োগফলকে ৭ দিয়ে ভাগ করলে মিলে যাবে এনকি যদি ৮ বিয়োগ করা হয় তাহলেও ৮ দিয়ে ভাগ করলে মিলবে। আবার যদি ৯ বিয়োগ করা হয় সেক্ষেত্রেও ৯ দিয়ে ভাগ করলেও মিলে যাবে।

সংখ্যাটি আসলে ৭, ৮, ৯ এর ল.সা.গু. — ৫০৪।

হাতে কলমে করে দেখা যাক —

৫০৪ - ৭ = ৪৯৭ ; ৪৯৭ / ৭ = ৭১

৭ দিয়ে ভাগ অনায়াসে হচ্ছে।

এ ভাবেই , ৫০৪ - ৮ = ৪৯৬ ; ৪৯৬ / ৮ = ৬২

এখানেও ৮ দিয়ে ভাগ করলে মিলে যাচ্ছে।

আবার ৫০৪ - ৯ = ৪৯৫ ; ৪৯৫ / ৯ = ৫৫

৯ দিয়ে কি চমৎকার ভাবে ভাগ হয়ে গেল ।

এমন হবার কারণটা কি? যেহেতু ৫০৪ এর কোন তিন অঙ্কের গুণিতকই নেই তাই এর একমাত্র উত্তর ৫০৪ ই হবে।

আপাত অসম্ভব একটি ভাগ ঃ

$$\frac{১০০ - ১০০}{১০০ - ১০০} = ২$$

কি মনে হচ্ছে প্রমাণ করা অসম্ভব !

দেখা যাক চেষ্টা করে —

$$\frac{১০০ - ১০০}{১০০ - ১০০} = \frac{১০^{২} - ১০^{২}}{১০(১০ - ১০)} = \frac{(১০ - ১০)(১০ + ১০)}{১০(১০ - ১০)}$$

$$\frac{২০}{১০} = ২$$

প্রমাণ হল তো আপাত অসম্ভবও সম্ভব !

একটু অন্য স্বাদের ধাঁধা ঃ

১০০ থেকে ২০০ র মধ্যে এমন একটি সংখ্যা বার করতে হবে যার এককের অঙ্কে আছে ২, তারপর ২ কে ঘুরিয়ে সামনে আনলে দেখা যাবে সংখ্যাটা ২০০ থেকে যত বেশী প্রথম সংখ্যাটি ২০০ থেকে ততটাই কম ছিল। হ্যাঁ, একটু ভাবতে হবে বৈকি!

দেখা যাক —

সংখ্যাটি হল ১৮২ কারণ ১৮২ র এককের ঘরে থাকা ২ কে ঘুরিয়ে সামনে আনলে সংখ্যাটি হয় ২১৮

২০০ - ১৮২ = ১৮

২১৮ - ২০০ = ১৮

তাহলে দেখা গেল যে ১৮২ সংখ্যাটি এমনই একটি সংখ্যা যার এককের ঘরে থাকা ২ কে ঘুরিয়ে সামনে আনলে দেখা যাচ্ছে সংখ্যাটা ২০০ থেকে যত বেশী প্রথম সংখ্যাটি ২০০ থেকে ততটাই কম।

দুটি অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সংখ্যা ঃ

কিছু কিছু সংখ্যার অদ্ভুত কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যেজন্য তারা অন্যদের চেয়ে একটু আলাদা হয়ে যায়। এরকমই দুটি সংখ্যা হল, ৬৫৬১ ও ৮২৮১। দুটি সংখ্যারই অঙ্কগুলিকে যোগ করে যদি উল্টে দেওয়া যায় তাহলে পাওয়া যায় আসল সংখ্যার বর্গমূল।

হাতে কলমে যোগ করে দেখা যাক —

৬৫৬১ = ৬ + ৫ + ৬ + ১ = ১৮ ; উল্টে দিলে ৮১ = $\sqrt{৬৫৬১}$

আবার, ৮২৮১ = ৮ + ২ + ৮ + ১ = ১৯ ; উল্টে দিলে ৯১ = $\sqrt{৮২৮১}$

চারটি ৯ দিয়ে কি ১০০ বানানো যায় ঃ

চেষ্টা করে দেখা যাক — ৯৯ + ৯ / ৯ = ৮৯১ + ৯ / ৯ = ৯০০ / ৯ = ১০০

শিক্ষা

প্রতিম চ্যাটার্জী

কলকাতায় শীতের মেয়াদ আর ক'দিন। যদিও বাংলা ক্যালেন্ডারে লেখা পৌষ মাঘ এই দু'মাস শীতকাল। এই নিয়ে অনেক পুরাতনী ছড়া আছে যেমন 'পৌষের শীতে মোষের শিং নড়ে', 'মাঘের শীত বাঘের গায়ে'। তবু আজকাল কলকাতায় শীত পড়ে পড়ে করেও পড়ে না। কালীপুজোর পর থেকে কলকাতার মানুষ প্রস্তুতি নেয় এই বুঝি ঠান্ডা পড়বে, এই বুঝি ঠান্ডা লাগবে তাই বার হয় লেপ কম্বল আলোয়ান কত না রংবেরঙের গরম জামাকাপড়। অবশেষে শীত পড়ে ইংরেজী ক্যালেন্ডারের নিয়ম মেনে বড়দিন থেকে জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত। আর এই সময়টাই কলকাতার মানুষজন তাদের আলমারীতে বন্ধ শীত বস্ত্রগুলোর সদব্যবহার করার সুযোগ পায়।

বাস স্টপেজের নাম পি.টি.এস.। পুরো নাম পুলিশ ট্রেনিং স্কুল ছোট করে পি.টি.এস. কে কেউ কেউ ঠাট্টা করে বলেন এখানে পিটিয়ে এস বানানোর শিক্ষা দেওয়া হয়। সে যাই হোক পি.টি.এস-এর উল্টোদিকে রেস কোর্স, একটু দূরে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সাদা চূড়া তার মাথায় কালো পরী ডানা মেলে ওড়ার অপেক্ষায়। রেসকোর্সে জকিরা প্র্যাকটিস করছে, মিলিটারী, পুলিশ খেলোয়াড়েরা জগিং করছে। সব মিলিয়ে এখানকার পরিবেশটা বড় মনোরম। এখান থেকেই রোজ বাস ধরি কর্মস্থলে যাবার জন্য। অনেকেই ধরেন তাই এখানে অপেক্ষমান যাত্রীর সংখ্যা অনেক। একটি মেয়ে কতই বা বয়স ১০/১২র মধ্যে পথচারী নয়, যাত্রীও নয় ভিখারী। নিত্যযাত্রীদের মতই ও নিত্য ভিখারী। আমাদের নিত্যযাত্রীদের কাছে ভিক্ষা করে পয়সা চায়। আচ্ছা, শিশু ভিখারী কি শিশু শ্রমিকদের মধ্যে পড়ে?

দিনটা ছিল বড়দিনের আশপাশ। আজ কলকাতায় শীত পড়েছে জাঁকিয়ে। আবহাওয়া দপ্তর এখন অনেকটাই সঠিক বার্তা দেয়। তাদের খবর অনুযায়ী ঠান্ডা চলবে আরো বেশ কয়েকদিন সঙ্গে কুয়াশা আর কনকনে ঠান্ডা হাওয়া, ঠান্ডা আরো বাড়তে পারে।

রোজকার মত সেদিনও সকালে বেরিয়েছি তবে পোষাকে পরিবর্তন ঘটেছে আমার কেন সবারই। গায়ে জ্যাকেট, মাথায় মাংকি ক্যাপ, গলায় মাফলার। বেশ লাগছে পকেটে হাত ঢুকিয়ে পথ চলতে।

পি.টি.এস.-এর চেহারায় আজ পরিবর্তন। রেসকোর্সের রেলিংগুলো কুয়াশায় ঢাকা তারই মাঝে ছায়ামূর্তির মত জকিদের আনাগোনা। ভিক্টোরিয়ার সাদা চূড়াও আবছা কিন্তু তার মাথায় কালো পরী একেবারে অদৃশ্য। বিলেত না গিয়েও এখানে বিলেতকে অনুভব করা যায়।

আমরা নিত্যযাত্রী, শিশু ভিখারীটাও নিত্য। ওর পোষাকে আজ পরিবর্তন। গায়ে একটা শতছিন্ন চাদর শীতে হি হি করে কাঁপতে কাঁপতে ও ভিক্ষে করছে। অনেকদিনই কিছু দিই না আজ কিন্তু দুটো টাকা দিলাম। মেয়েটি চলে গেল অনত্র। কিন্তু মন থেকে গেল না। সারাদিন কাজের ফাঁকে ঝিলিক মারতে লাগল ওর শীতে কাঁপা চেহারাটা, শীতে ফেটে যাওয়া মুখটা। বাড়ি ফিরে টি.ভি. দেখেও সেটা কাটলো না।

আচ্ছা বাড়িতে তো অনেক গরমের চাদর বেফালতু আলমারীতে বন্ধ হয়ে পড়ে আছে, তারই একটা মেয়েটিকে দিলে কেমন হয়? যেমন ভাবা তেমনি কাজ। তাড়াতাড়ি আলমারী খুলে বার করলাম একগাদা গরমের পুরনো চাদর তার মধ্যে থেকে সবচেয়ে খারাপটা বেছে নিলাম ভিখারী মেয়েটাকে দেব বলে। পাছে সকালে ভুলে যাই সেই ভয়ে তখনই প্যাকেট করে অফিস যাবার ব্যাগে ভরে রাখলাম।

পরদিন সকালে সেই প্রচলিত দৃশ্য। মেয়েটি ভিক্ষা চাইতে কাছে এল। সতর্ক হয়ে প্রশ্ন করলাম, ''হ্যাঁরে তোকে যদি একটা পুরনো চাদর দিই তুই নিবি?'' মেয়েটি চেতলা পড়া দাঁতে একগাল হেসে বললো, ''তুমি দিলে আমি নেব না কেন কাকু?'' ব্যাগ থেকে প্যাকেটটা বার করে ওর হাতে দিলাম। মেয়েটি চলে গেল আমিও আমার বাসে উঠে পড়লাম।

দিনটা ছিল শুক্রবার। শনি, রবি আমার ছুটি। বড়দিনের ছুটি উপভোগ করার রেস্ত আমার নেই তবু দু'টো দিন বড় ভাল কাটলো সোমবারের অপেক্ষায়। সোমবার পি.টি.এস.-এ গিয়ে দেখব আমার দেওয়া চাদরটা গায়ে দিয়ে মেয়েটি ভিক্ষে করছে এই প্রবল শীতের মধ্যেও একটুও কাঁপছে না।

সোমবার সকাল হল। একটু তড়িঘড়িই বেরিয়েছি আমার স্বপ্নের ছবিটা বাস্তবে দেখব বলে। ওমা একি দেখি! সেই মেয়ে সেই শতছিন্ন চাদর, সেই শীতে ঠক ঠক করে কাঁপা সেই ভিক্ষাবৃত্তি, মাথায় আগুন জ্বলে গেল ছিঃ ছিঃ। মেয়েটি কাছে এল অভ্যাস মত হাত পাতল। অন্য যাত্রীদের কান বাঁচিয়ে চাপা স্বরে অথচ কঠিন গলায় বললাম ''কিরে চাদরটা বেচে খেয়েছিস। সেই জন্যে তোদের কিছু করতে নেই, তোদের কেউ কিছু করতে পারবে না''। মেয়েটি হাসল, আমার মুখের দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে বলল, ''তুমি কি বোকা কাকু ঐ চাদরটা গায়ে দিয়ে ভিক্ষে চাইলে কেউ কি আমায় ভিক্ষে দেবে? তোমার চাদরটা এখন আমার নানী গায়ে দিয়েছে, বিকালে আমি দেব তখন তো আর আমি ভিখারী নই।''

মনে হল কেউ যেন আমার দু'গালে ঠাস ঠাস করে চড় মারল। আমার শিক্ষা, দীক্ষা অহংবোধ সবকিছু আজ পথের এই ভিখারী মেয়েটা জলাঞ্জলি দিল। স্কুল কলেজে না গিয়েও জীবনের সহজ পাঠ কত সহজে শিখে নিয়েছে ও। কতবার তো পড়েছি ভেক না ধরলে ভিক্ষা মেলে না, কিন্তু এমনভাবে তো কেউ বুঝিয়ে দেয় নি। সত্যিই আমি কি বোকা।

লজ্জায় আড়চোখে আশেপাশে তাকালাম কেউ আমায় লক্ষ্য করছে না তো? আকাশের দিকে মুখ তুললাম ভিক্টোরিয়ার মাথায় কালো পরী সে আমার দিকে অস্কারওয়াইল্ডের 'হ্যাপি প্রিন্সে'র মত আমায় দেখছে না তো? না । এখনো কুয়াশা। কুয়াশায় ঢাকা কালো পরী। ঐ তো আমার বাস এসে গেছে। চলন্ত বাসে উঠে পালিয়ে বাঁচলাম। পালিয়ে কি বাঁচা যায়? যদিও শাস্ত্রে বলছে 'য পলায়তি স জিবতি'।

প্রতিশোধ

অনির্বাণ মন্ডল

রাত পৌনে এগারোটা। দিলীপ স্যান্যাল এতক্ষণে বিছানায় গিয়ে শুলেন। আজকে ওঁর পার্টটাইম কাজের জন্য অনেক দেরী হয়ে গেল। এটাকে ওভারটাইম কাজ বলা যায় না কারণ অফিসের কাজ অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে এই পার্টটাইম কাজটা করেন উনি। এই কাজটা উনি শুরু করেন যখন উনি দেখলেন যে তাঁর ও তাঁর পরিবারের রোজ ভরপেট ভাত জুটছে না। আর অন্যদিকে কিছু শ্রেণীর লোক যা ইচ্ছা তাই করে পয়সা নষ্ট করে বেড়াচ্ছে।

এই পার্টটাইম কাজটা হোল ছিনতাই, ডাকাতি — যা হোক করে পয়সা লুটে নেওয়া। শুরু করেছিলেন অভাবে পড়ে, তখন অফিসের মাইনে ছিল অনেক কম। কিন্তু এখন অফিসের মাইনে অনেক বেড়ে গেছে, এই মাইনেতেই হেসে খেলে চলে যাচ্ছে। একবার নেশা শুরু করলে সেই নেশা কি আর চট করে ছাড়ে! মানুষের চরিত্র ঊনিশ কুড়ি বছর অবধি গড়তে থাকে। এই সময় যা অভ্যাস করবে মানুষ সেই অভ্যাস তার মৃত্যুর দিন অবধি থাকবে। তাই এই ছিনতাই এর কাজটা দিলীপবাবু আর কি করে ছাড়েন। দ্বিতীয়ত একবার টাকার লোভ পেয়ে গেলে কি সেই লোভ আর সংবরণ করা যায়? দিলীপবাবু এখন বুঝে গেছেন টাকা থাকলে কত আরামে বাস করা যায়। এখন কি আর আগের মতো ডাল ভাত খেয়ে থাকতে পারবেন? পরের টাকায় একখানা বড় বাড়ী করেছেন। সেই বাড়ীতে থেকে ডাল ভাত খাওয়াটা দিলীপবাবুর কাছে শুধু অসম্ভবই নয় অবাস্তব।

রোজকার ছিনতাই এর মতো কিন্তু আজকে দিলীপবাবু অমন করেন নি। আজকের নিয়মে অল্প কেন, বেশ ব্যতিক্রম ঘটেছে।

এখন দিলীপবাবু ছিনতাই-এর এ্যাটেম্‌ট রোজই নিচ্ছেন। কারণ সামনেই মেয়ের বিয়ে। বিয়েটা বেশ জাঁকজমক করে দেবেন ভেবেছেন। রোজকার মত আজকেও ছিনতাই এর সরঞ্জাম হিসেবে একটা ছুরি নিয়ে নিয়েছেন ব্রিফকেসে। অফিসে এমনিতেই দেরী হয়ে গিয়েছিল ওভারটাইম এর জন্য। অফিস থেকে ফিরবার পথে 'দুর্গা জুয়েলার্স'এ দেখলেন একজন ভদ্রলোক কি নিয়ে দরাদরি করছেন। তারপর একটু উঁকি ঝুঁকি মেরে ভাল করে দেখে বুঝলেন যে ভদ্রলোক এখানে একটা হার, একজোড়া আংটি ও একজোড়া দুল করতে দিয়েছিলেন এখন সেগুলো নিয়ে যাচ্ছেন। দিলীপবাবু ভাবলেন যে এই সুযোগ। ভদ্রলোকটি বাইরে বেরুতেই দিলীপবাবু তাঁকে ফলো করতে লাগলেন ও মওকা খুঁজতে লাগলেন, কখন ঐ জিনিষগুলো হাত করা যায়। একটা ফাঁকা জায়গা পেয়ে চেপে ধরলেন ভদ্রলোকটিকে। ছোরা দেখালেন। তাতেও দিতে নারাজ হতে দিলীপবাবু দিক্‌বিদিক জ্ঞানশুণ্য হয়ে অপকর্মের চূড়ান্ত করে ফেললেন — খুন।

আজকে বাড়ী ফিরে খাওয়ায় মন বসল না, সোজা গিয়ে শুয়ে পড়লেন — ভাবলেন একবার ঘুমিয়ে পড়তে পারলে স্বস্তি পাবেন। কিন্তু ঘুম কি আর এত চট করে আসে? একবার এধার ফিরে শুচ্ছেন, একবার ওধার ফিরছেন কিন্তু বারে বারে সেই মুখ ফিরে আসছে চোখের সামনে। অস্বস্তি বোধ হতে দিলীপবাবু পায়চারি করতে লাগলেন। একটু পরে মুখ চোখ ধুয়ে মুছে আবার শুতে গেলেন। অন্য চিন্তায় মন ঘোরাতে চাইলেন। ভাবতে লাগলেন সামনে মেয়ের বিয়ে বেশ জাঁকজমক করে দেবেন। খুনের চিন্তা আসতেই মনে মনে শপথ করে নিচ্ছেন যে জীবনেও আর এই সব কাজ করবেন না। কিন্তু এই সব চিন্তা করে কি আর কাটানো যায় সেই মুখ?

এবার আর কোন ভাবাটাবা নয় একেবারে একটা পত্রিকা নিয়ে বসলেন। পত্রিকাটা থেকে একটা মজার বা হাসির গল্প পড়তে লাগলেন দিলীপবাবু। কিন্তু এমন সময়ে কি আর হাসি আসে? দিলীপবাবু একটা হাসির জায়গা এলেই হাসবার চেষ্টা করছেন, কিন্তু প্রাণখুলে মনের ভেতর থেকে হাসতে পারছেন না। কেবল দাঁত বার করে ঠোঁট দুটো দু'দিকে প্রসারিত করে দিচ্ছেন। হঠাৎ হাসতে গিয়ে দিলীপবাবুর মনে হল যেন সেই লোকটা তাঁর দিকে তাকিয়ে প্রতিহিংসার হাসি হাসছে।

দিলীপবাবুর আর পড়তে ভাল লাগছে না। তাঁর মনে হল যেন অল্প অল্প ঘুম আসছে। তিনি পত্রিকাটা রেখে চশমা খুলে, এক গ্লাস জল খেয়ে, আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লেন।

পাঁচ দশ মিনিট মটকা মেরে পড়ে রইলেন। মনে হল যেন ঘুম এসে ঘিরছে আস্তে আস্তে। দিলীপবাবুর হঠাৎ মনে এল যে, খুনের ছুরিটা এনেছেন তো? তারপর বালিশের তলায় হাত ঢুকিয়ে দেখে নিলেন আছে, চোরাই জিনিষগুলোও আছে।

এখন দিলীপবাবুর প্রায় ঘুম চলে এসেছে। কিন্তু তন্দ্রা ভাবটা একটা 'খুট' আওয়াজে ভেঙে গেল। মনে হল যেন সদর দরজাটা কেউ খুলল। কিন্তু দিলীপবাবুর বেশ ভালই মনে পড়ছে যে দুটো তালাই তিনি লাগিয়ে দিয়েছেন। দিলীপবাবু আর উঠে গিয়ে দেখলেন না। তার কারণ প্রথমত কুঁড়েমি লাগছিল, দ্বিতীয়ত এখন ওঠাউঠি করলে ঘুমটা পুরো নষ্ট হয়ে যাবে আর তৃতীয়ত ভয়ও অল্প করছিল কারণ দিলীপবাবুর নিজের ঘরটা অনেক বড়। সেই লন পেরিয়ে দরজা খুলে দিলীপবাবুর ঘরটার আড়াইগুণ বড় দালান পেরিয়ে তবে দেখতে হবে। আর চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। দিলীপবাবু শব্দটাকে মনের ভুল ভেবে নিয়ে শুয়ে পড়লেন।

কিন্তু হায়! শুয়েও কি স্বস্তি আছে? একটু পরেই দিলীপবাবু দালানে খস্‌খস্‌ আওয়াজ শুনতে পেলেন। দিলীপবাবুর মনে হল কেউ ধুলোপায়ে দালানের উপর হাঁটছে। আবার তিনি ভাবছেন যে কেন তিনি এই সব কথা ভাবছেন? কেন তিনি এইসব ভাবনাগুলোকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন? এই সবই তো মনের ভুল। এখন বিজ্ঞান এতো উন্নত হয়েছে, এখন কি আর ভূত বলে কিছু আছে? এখন যদি দিলীপবাবু কাউকে বলেন যে তিনি ভূত দেখেছেন তাহলে লোকে তাঁকে পাগল বলবে। কিন্তু এই সব চিন্তা ছাপিয়ে মনের মধ্যেকার আসল চিন্তাটা বেরিয়ে পড়ছে। কেন দরজায় খুট করে আওয়াজ হলো? কেন বারান্দায় খস্‌খস্‌ আওয়াজ হচ্ছে?

ক্রমশ আওয়াজটা এগিয়ে আসছে আর দিলীপবাবুর বুকেও

ধুকপুকুনি বাড়ছে গলা শুকিয়ে আসছে, একবার পাশের ঘরের মিনুকে ডাকতে চেষ্টা করলেন কিন্তু পারলেন না — গলা থেকে স্বর বেরলো না। মিনু হচ্ছে দিলীপবাবুর বড় মেয়ে যার বিয়ের জন্য এতো তোড়জোড়।

দিলীপবাবু বুঝতে পারছেন যে আওয়াজটা দালানের অর্দ্ধেক অবধি এসেছে। তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে স্থির শুয়ে থেকে চোখ মেলে শুধু লাল রঙের নাইট ল্যাম্পটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর মনে হল যেন ওই আলো থেকে লাল রঙের আলো টুপ টুপ করে মেঝেতে পড়ছে — আর ভাবতে পারলেন না, চোখ বুজে অন্য দিকে পাশ ফিরে শুলেন।

দিলীপবাবু একটুখানি অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলেন, আজকের ঘটনাগুলো ও মেয়ের বিয়ের কথা ভাবছিলেন। হঠাৎ উনি বাস্তবে ফিরে এলেন এবং ওনার বুকটা ধড়াস করে উঠল — পায়ের আওয়াজটা দরজার কাছে। এরপর নাইট ল্যাম্পের লাল আলোটায় দেখতে পেলেন দরজায় গোদরেজ-এর নবটা আস্তে আস্তে ঘুরে যাচ্ছে। দিলীপবাবু প্রথমে প্রচন্ড ভয় পেলেন। কিন্তু একটু পরে নিশ্চিন্ত হলেন এই ভেবে যে দরজার উপরের ছিটকিনিটা ভালোভাবেই আটকানো আছে। কিন্তু নিশ্চিন্ত হয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারলেন না, এই নিশ্চিন্তি স্থায়ী হল না। দিলীপ স্যান্যাল দেখতে পেলেন এক পাল্লার দরজাটা আস্তে আস্তে খুলে যাচ্ছে ....., পুরো খুলে গেল; দিলীপবাবু হাত বাড়িয়ে আলো জ্বালতে গেলেন জ্বলল না। দিলীপবাবু ভাবলেন যদি পুলিশ এসে থাকে তাহলে আবার একটা খুন করবেন; যেই ভাবলেন অমনি তিনি বালিশের তলায় হাত ঢুকিয়ে দিলেন সেই রক্তাক্ত ছুরিটা বার করবার জন্য। কিন্তু কই? কই সেই ছুরি? ছুরি তো বালিশের তলায় নেই? গয়নার বাক্সটাও তো নেই বালিশের তলায়?

এদিকে ঘরের ভিতরে আস্তে আস্তে ঢুকে আসছে একটি শরীর। দিলীপবাবুর চোখ এবার এড়িয়ে গেল। ঐদিকে চোখ যেতেই একেবারে চক্ষু স্থির হয়ে গেল দিলীপবাবুর। তাঁর এখন মনে হচ্ছে মাথার তলায় আর বালিশ নেই, দেহের তলায় বিছানা নেই মনে হচ্ছে যেন শরীরের ভিতর রক্ত নেই হাতে পায়ে কোথাও জোর নেই ও মাথার মধ্যে এখন আর মাথা নেই। সব মিলিয়ে মনে হচ্ছে যেন তাঁর কোনও অস্তিত্বই নেই। যদিও অস্তিত্বের অভাব ঘটেছে কিন্তু অনুভব শক্তির লোপ হয়নি। ভয়ে তাঁর নাড়ী টাড়ী সব শুকিয়ে পাকিয়ে যাচ্ছে।

দরজার কাছ থেকে দিলীপবাবুর দিকে যে মূর্তিটা অগ্রসর হচ্ছে ধীরগতিতে তার বুকে ছোরা বিঁধে আছে। এইটাই তো দিলীপবাবুর ছোরা যা দিয়ে তিনি আজ খুন করেছিলেন। এই তো সেই মুখ। সেই চেহারা। এই তো বাঁ হাতে গয়নার বাক্সটা। এই তো সেই লোক যাকে তিনি আজ খুন করেছিলেন।

এখন দিলীপবাবুর দিকে এক পা এক পা করে এগিয়ে আসছে লোকটা। দিলীপবাবুর মনের অবস্থা লিখে বোঝানো শক্ত। তিনি আবার আস্তে করে মিনুকে ডাকতে গিয়েও পারলেন না। মূর্তিটি এবার ঘরের অর্দ্ধেকটা এসেছে, দিলীপবাবু এখন আবার মূর্তিটির পুরো শরীর দেখতে পাচ্ছেন।

মূর্তিটি এখন দিলীপবাবুর বিছানা থেকে আর তিন পা দূরে আছে ..... আর দুই পা ..... আর এক ....., দিলীপবাবু আর থাকতে পারলেন না — ''বাঁচাও'' বলে চেঁচাতে গেলেন কিন্তু মূর্তিটি বাঁ হাতটা গয়নার বাক্স বিছানায় রেখে দিলীপবাবুর মুখটা চেপে ধরল এবং একটা ক্রুর হাসি হাসল। দিলীপবাবু লোকটার মুখ চেপে ধরেন। দিলীপবাবুর মুখ যখন মূর্তিটি চেপে ধরেছিল তখন দিলীপবাবুর চোখ একবার টেবিল ক্যালেন্ডারের দিকে গেল — দেখলেন আজ পনেরোই এপ্রিল — দিলীপবাবুর জন্মদিন। মূর্তিটির ডান হাতের ছোরাটা যখন দিলীপবাবুর বুকের কাছে চলে এসেছে, তখন দিলীপবাবু আলমারীর উপরে রাখা, চোরাই অটোমেটিক্ টাইম পিস্ টায় দেখলেন বাজে এগারোটা ছাপ্পান্নো — দিলীপবাবুর জন্মের সময়। দিলীপবাবু একটি 'আঁ' শব্দ করে অক্কা পেলেন।

একাকিনী

বাণীরূপা চক্রবর্তী

মামণি, ও মামণি! এখনও কাপড়গুলো তোলনি? আকাশটার দিকে একবার তাকিয়েছ? রাকার ডাকে সম্বিত ফিরল নির্মলা মায়ের। আজ সকাল থেকেই তিনি যেন বারে বারে আনমনা হয়ে পড়ছেন। কেন যে হচ্ছেন, নিজেই ভেবে পাচ্ছেন না, তবে কি আশ্রমের নতুন মেয়েটাকে দেখার পর? কি জানি, হবে হয়তো। আবার নিজেকে নিজেই বোঝাতে বসলেন না না, এ আবার নতুন কি, আশ্রমে তো অনেকেই আসে আবার চলেও যায়। কিন্তু কেন কে জানে এই মেয়েটাকে দেখার পর থেকেই নির্মলার নিজের অতীত আনমনা করে তুলছে।

শহরের উপকণ্ঠে একটি মহিলা আশ্রমের কর্ণধার নির্মলা। এখানে নানা সমস্যায় জর্জরিত অত্যাচারিত মেয়েরা আসে, আবার অনেক দুঃস্থ মেয়েও আসে, নির্মলা তাঁর সাধ্যমতোই করেন। সৎ পরামর্শ দেওয়া, এমন কি প্রয়োজনে তাদের থাকার, খাওয়ারও বন্দোবস্ত। স্বামীর মৃত্যুর পর এত দিন বাড়িতে একা হাঁপিয়ে উঠছিলেন। একমাত্র ছেলে করঞ্জলকে শিক্ষা-দীক্ষা, সংস্কৃতি সবদিক দিয়ে একজন রুচিশীল মানুষ করেছিলেন। ভেবেছিলেন ছেলে ভাল চাকরি করলে ভালো পরিবারের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেবেন, কিন্তু বিধি বাম, সবকিছু কেমন ওলোটপালোট হয়ে গেল। স্বামী ইন্দ্রানুজের মৃত্যুর পর ছেলে পড়া শেষ করে গেল ভিন রাজ্যে চাকরির সুবাদে। সেখানেই একটি মেয়ের প্রেমে হাবুডুবু খেয়ে মাকে চিঠি লিখে জানিয়ে দিল ওই মেয়ে ছাড়া কাউকে জীবনসঙ্গিনী হিসাবে ভাবতেই পারছে না। অগত্যা মেনে নেওয়া ছাড়া কোন উপায়ও ছিল না। করঞ্জল এর বিয়ের পর এবাড়িতে আবার নতুন অতিথি আসবে, ছোট ছোট পায়ে কেউ হেঁটে বেড়াবে, দস্যিপনা করবে, স্বপ্নভঙ্গ হতে বেশি দেরি হল না নির্মলার। এদিকে এতবড় বাড়ি তো তাকে যেন সবসময় গিলতে আসছে, তখনই ঠিক করলেন সামাজিক কিছু দায়দায়িত্ব নিলে হয়তো তাঁর একাকীত্ব কাটবে। ঈশ্বরের আশীর্বাদে স্বামী যা পয়সা

রেখে গেছেন তাতে দু'দশটা মানুষের দায়িত্ব নিতে কোন অসুবিধা নেই। করঞ্জলকে জানিয়েছেন সেই কথা। ও সাফ বলে দিয়েছে এ বিষয়ে ওর কোন আপত্তি নেই, শুধু মায়ের কাছে গিয়ে বৌকে নিয়ে থাকাতেই আপত্তি। যাই হোক, সবকিছু মেনে নিয়ে এগিয়ে এলেন এই আশ্রমটাকে গড়ে তুলতে। জুটে গেল পাঁচ ছ'টা মেয়ে বৌও। একটা ব্যাপার লক্ষ্য করলেন, এদের প্রত্যেক্যের মধ্যেই রয়েছে মানিয়ে নেওয়ার আর শেখার অদম্য ইচ্ছে। হয়তো পরিস্থিতিই তাদের এই সুপ্ত ক্ষমতাকে জাগিয়ে তুলেছিল। ক'মাসেই তারা বাড়িটাকে আর সংলগ্ন বাগানটাকে ছবির মতো সাজিয়ে তুলেছে। রাকা বলো, পলা বা অচলা বা ঝিন্টি, সবাই এক একটা দায়িত্ব নিয়েছে। কেনই বা নেবে না এটাই তো তাদের সুইট হোম। হোক না দ্বিতীয় বাড়ি, তবু তো ভরসার ভালবাসার আশ্রয়স্থল। ঝুলন মাসিকে ঘিরে সবাই খুব হাসাহাসি করছে। হাসির শব্দে নির্মলাদেবী অতীত থেকে ফিরে এলেন বাস্তবে। বাইরে যতই শান্ত ভাব বজায় রাখার চেষ্টা করছেন ততই যেন ভেতরের ছটফটানি বাড়ছে। আচ্ছা, ঝুলন তো প্রথম থেকেই ইন্দ্রানুজ আর নির্মলার খুব কাছের, বড় আপনজন। ওকে জিজ্ঞেস করবে? তার পরক্ষণেই নির্মলাদেবীর ভেতর ভেতর কুঁকড়ে যাচ্ছেন যদি তাঁর সন্দেহটা সত্যি হয়ে দাঁড়ায়, কি বলে নিজেকে শক্ত রাখবেন। আচ্ছা এভাবেও তো ঝুলনকে জিজ্ঞেস করলে হয়, ঝুলন, মেয়েটির মুখটা কি তোমার চেনা চেনা লাগছে? আচ্ছা ঝুলন, এই নতুন মেয়েটাকে আগে কোথাও দেখেছ? না, না, এভাবে জিজ্ঞেস করতে নির্মলার বড় লজ্জা করছে। একটা হিমস্রোত যেন শিড়দাঁড়া বেয়ে ওঠানামা করতে লাগল। দরজার কাছে ঝুলন এসে নির্মলাকে জিজ্ঞেস করল, দিদি ইন্দ্রানীকে কী কাজ দেব? নির্মলা ঝুলনকে বললেন যাহোক একটা কিছু করতে বল, পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, নতুন এসেছে, ওকে দু'দিন বরং রেস্ট দে, তারপর ভাবা যাবে কি দেওয়া যায়। এরপরই সিদ্ধান্তটা নিয়ে ফেললেন। কাল কোন্নগর থেকে ঘুরে এলে কেমন হয়? পলাকে বললেন, পলা সবসময় ওদের পেছনে খবরদারি না করে সব ঠিকমতো হচ্ছে কিনা একটু খেয়াল রাখিস। কাল একটু বেরোব। পলা জিজ্ঞেস করল, মামণি কতদূর যাবে? নির্মলা সেটাকে এড়িয়ে গিয়ে বললেন, ফিরতে দেরি হলে চিন্তা করিস না। হয়তো নাও ফিরতে পারি। আর শোন, গতকাল যে মেয়েটা এসেছে ওর দিকে একটু নজর রাখিস। সবাই মিলে গল্পগুজব করে ওকে হাল্কা করার চেষ্টা কর। আচ্ছা, নতুন কিছু জানতে পারলি? না মামণি, কাল তোমার কাছে যা বলেছে সেটুকুই। এর বেশি কিছু নয়। ঠিক আছে ঝিন্টিকে বল বাগান থেকে সব্জিগুলো তুলে ধুয়ে রাখতে। যতীনকে বলিস ইলেকট্রিক বিল আর টাকাটা যেন এনার কাছ থেকে নিয়ে যায়। আমাকে আর এখন ডাকবি না। জরুরি দু'একটা কাজ আছে, ওগুলো সেরে ফেলা দরকার। তারপরই দরজা বন্ধ করে ইন্দ্রানুজের পুরনো ট্রাঙ্কটা খুলে বসলেন। খুলতেই যেন একরাশ অতীত তার গন্ধ, আর মন হু হু করা অনুভূতি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। পুরনো প্যান্ট, সার্ট, সোয়েটার, মাফলারের তলায় একটা গ্রুপ ফটো ও আর একটা ইন্দু ও কালোনের যৌবন বয়সের ছবি। কালোন ইন্দুর খুড়তুতো বোন। কোন্নগরে থাকে। দুই ভাই বোনের খুব ভাব ছিল ইন্দুর চলে যাওয়ার শেষদিন পর্যন্ত। কালোন বিয়ে করেনি। পৈতৃক বাড়িতেই থাকে। স্কুলে বাংলা পড়ায় আর পিসিমা - কাকিমার দেখভাল করে দিন কেটে যায়। ইন্দু চলে যাওয়ার পর বিশেষ আসে না। কিন্তু নিয়মিত নির্মলার সঙ্গে যোগাযোগ আছে। ইন্দ্রানীকে ওই ই পাঠিয়েছে নির্মলার আশ্রমে। অন্যান্যরা যখন এই আশ্রমে প্রথম আসে তখন নির্মলা তাদের কাছ থেকে নানারকম ভাবে কথা বলে অনেক তথ্য জোগাড় করেন। ইন্দ্রানীর ক্ষেত্রে কালোনই হচ্ছে একমাত্র সোর্স যে নির্মলাকে অনেক কিছু জানাতে পারবে। কিন্তু ইন্দ্রানীকে কালোন এখানে পাঠিয়েছে বসন্তদার সঙ্গে একটা চিঠি দিয়ে, তাতে লেখা, ''মেয়েটিকে একটু আশ্রয় দিও''।

ইন্দুর এই ট্রাঙ্কটা নির্মলা একদমই খোলেন না। খুললেই মন হু হু করে। খুঁজে খুঁজে নির্মলা বাড়ির দলিলটা বার করলেন। ফটো দুটোও ব্যাগে গুছিয়ে নিয়ে ট্রাঙ্কটা ঢুকিয়ে রাখলেন। ব্যাঙ্কে আর উকিলদাদার কাছে যাওয়ার জন্য তৈরি হলেন। তিতিরকে বললেন ঘরটা একটু পরিষ্কার করতে।

পরের দিন নির্মলা গেলেন কালোনের কাছে। কালোন নির্মলাকে দেখে কিছুটা আন্দাজই করেছিল। বৌদিকে হাত মুখ ধুতে পাঠিয়ে খাবারের ব্যবস্থা করতে গেল। স্কুলেও একটা ফোন করে জানিয়ে দিল যে আজ যেতে পারবে না। যদিও একটা জরুরী মিটিং ছিল কিন্তু কান্তাদিকে বলে সেটা ম্যানেজ করে নিল। নির্মলাকে মিষ্টি আর জল দিয়ে পিসিমা আর কাকিমার ঘরে নিয়ে গেল। নির্মলা তাদের সঙ্গে কথাবার্তায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। কালোনের কপালে কিন্তু একটু চিন্তার ভাঁজ উঁকি দিচ্ছে, বৌদি কি তবে কিছু বুঝতে পেরেছে? কোনও সন্দেহ কি বৌদিকে কুরে কুরে খাচ্ছে? না হলে কেন এমন হঠাৎ আগমন!

দুপুরবেলা খাওয়াদাওয়ার পর বিশ্রাম নিতে বলতে যেতেই নির্মলা কালোনকে ধরলেন। ''কালোন তোমার সঙ্গে আমার একটু কথা ছিল,'' কালোন এই ভয়টাই পাচ্ছিল। অগত্যা ''বলো বৌদি কী কথা?'' একথা সেকথার পর নির্মলা ছবি দুটো বার করে কালোনকে দেখালেন। ইন্দুদার সঙ্গে নিজের ছবিকে দেখে কালোন একটু আনমনা হয়ে পড়ল। পরক্ষণেই গ্রুপ ফটোটার দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলল। এটা একটা চড়ুই ভাতির ফটো। ছোটবেলায় সব ভাই বোন, বন্ধু বান্ধবীরা মিলে বাড়ির বাগানে পিকনিকের আয়োজন করা হয়েছিল। কোনও চাঁদা দিয়ে নয়। যে যার বাড়ি থেকে রান্নার জিনিষ এনে কাঠ জ্বালিয়ে রান্না করা। সেখানেই ঠিক হয়েছিল জমানো পয়সা দিয়ে বাজারের স্টুডিওটা থেকে একটা গ্রুপ ফটো তোলার। ইন্দুদা নিজের গরজে আরও এক কপি করে ফটো ওয়াশ করিয়ে নিজের কাছে রেখেছিল। এ নিয়ে কম হাসাহাসিও হয়নি। অবশ্য এর একটা কারণও ছিল। এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন নির্মলা। নিস্তব্ধতা ভেঙে কালোনকে বললেন, ''ঠাকুরঝি এই কোণের দিকে যে মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে সে কে?'' প্রশ্ন শুনে কালোন চমকে গেল। নির্মলা এই চমকানিটা লক্ষ্য করেও তাকিয়ে রইলেন উত্তরের আশায়। কালোন ভাবছিল যদি এমন কিছু বলা যায় যাতে বৌদির মনে কোনও মেঘ জমতে না পারে। সে বলেছিল বৌদি তুমি নিশ্চয়ই বীরেন জেঠুকে বিয়ের পর দেখেছ? নির্মলা ঘাড় নাড়লেন। এরা

বীরেন জেঠুর বাড়িতে ভাড়া থাকত। তোমার বিয়ের আগেই ওরা এখান থেকে জব্বলপুরে চলে যায়। বাবা বদলির চাকরি করতেন, প্রথম প্রথম আমার সঙ্গে যোগাযোগও ছিল। তারপর তো জানোই যা হয়। ইচ্ছে থাকলেও রাখা সম্ভব হয়নি। ''তোমার দাদার বিয়ের কতদিন আগে ওরা এখান থেকে গেছে?'' ''তা হবে বৌদি বছর তিনেক''। ''ঠাকুরঝি তোমার দাদা এখন মান-অভিমান, রাগ, দুঃখ সব কিছুর ওপারে চলে গেছেন। তুমি বলতো সত্যি করে ব্যাপারটা কি ?'' ''ক-কী বৌদি?'' ''ঠাকুরঝি লুকিয়ো না।'' কালোন চুপ করে রইল। নির্মলা আবার বললেন ''তাহলে আমি যতটুকু জানি বলি তোমায়''। ''থাক না বৌদি, তুমি বরং একটু বিশ্রাম নাও।'' ''ঠাকুরঝি আমি বিশ্রাম নিতে আসিনি।'' ''বৌদি!'' ''হ্যাঁ ঠাকুরঝি তুমি বলো বা না বলো আমি আন্দাজ করেছিলাম। তোমার দাদার ব্যাপারটা। ন'দিনের জোড়ে বাপের বাড়ি থেকে ফেরার পরই তোমাদের ছোট দিদা আমাকে ঠারে ঠোরে কিছু কিছু বলতে চেষ্টা করেছিলেন, ভেবেছিলাম এ তো হয়েই থাকে বিয়ের আগে, একজন নারী পুরুষের মধ্যে ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে। পরিণতি বিয়ের দিকে নাও গড়াতে পারে । তোমার দাদা চলে যাবেন বলেই হয়তো মাঝে মাঝে বলতেন, 'নির্মলা তুমি আমাকে কোনওদিন ঘৃণা করবে নাতো'। আবার বলতেন 'আমি যদি কোনও ভুল করে থাকি আমায় ক্ষমা করবে তো'। 'প্রতারক, বিশ্বাসঘাতক ভাববে না তো?' শান্ত স্বভাবের মানুষ। মনে মনে যে খুব অনুশোচনা করতেন সেটা মারা যাবার দিন বুঝতে পারলাম। সন্ধ্যেবেলা চা খাচ্ছেন হঠাৎই বলে উঠলেন নিমি আমি কি মারাত্মক ভুল করলাম, কি অবিচার করে ফেললাম। কেন করলাম বলতে পারে? পারলে অমায় ক্ষমা করো' বলতে বলতেই উনি চেয়ারে বসা অবস্থাতেই ঢলে পড়লেন। ঠাকুরঝি ইন্দ্রানী কি দিতির আর তোমার দাদার ভালবাসার চিহ্ন?'' কালোন নির্মলার চোখ দুটির দিকে তাকিয়ে আর আকুতি ভরা প্রশ্ন শুনে নিজেও কেঁদে ফেলল কালোনের বুকের ভেতরটা ব্যথায় টনটন করে উঠল। একে একে বলতে লাগলো পুরনো দিনের কথা, বেকার দাদার ভালোবাসার কথা, তা নিয়ে অশান্তি, দু বাড়িতে জানাজানি, দিতির বাবার বদলি, অভিমানী দিতির কোনোরকম সম্পর্ক না রাখার কথা সবই বলল। কিন্তু দাদার ভালোবাসার চিহ্ন যে দিতি সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল সেটা দাদা আর কালোন জানতে পেরেছিল অনেক পরে, ততদিনে দাদার বিয়েও হয়েগিয়েছিল। হয়তো জানতোই না যদি দিতি নিজের মৃত্যুর আগে কালোনকে সব জানাতো। দিতির মৃত্যুর পর দিদা দাদুর কাছেই মানুষ হচ্ছিল ওর মেয়ে ইন্দ্রানী। ''ইন্দ্রানীরও ভাগ্য দেখ বৌদি, জন্মের আগেই বাবা মায়ের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন। বাবাকে তাই জানলোই না। জন্মের কয়েক বছর পরেই মারণ রোগে মায়ের মৃত্যু। তবুও সবই ঠিকঠাক চলছিল। দিদা দাদুর যত্নে পড়াশোনা, গানবাজনা বেশ চলছিল। দেখেশুনে ভাল ছেলের সঙ্গে বিয়েও দেওয়া হল। কিন্তু কপাল খারাপ। বিয়ের ক'মাসের মধ্যেই একে একে সব গুণ প্রকাশ্যে এল। মত্ত অবস্থায় মারধোর, সন্দেহ, খেতে না দেওয়া । অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে পালিয়ে আসা।'' কালোন সবই বলল বৌদিকে। নির্মলা সব শুনলেন তারপর যেটা বললেন তা শুনে কালোন এতটাই আশ্চর্য হলো যে ওর মুখ দিয়ে কিছুক্ষণ কথাই বেরলো না। নির্মলা বললেন, ''কালোন শোন আমি এরকমই কিছুটা আন্দাজ করেছিলাম। কারণ ইন্দুর মুখের সঙ্গে মেয়েটির মুখের খুব মিল। যে আশঙ্কা আমাকে সারাজীবন কুঁকড়ে রাখত সেটার সঙ্গে এভাবে মোকাবিলা করতে হবে তা ভাবিনি। গতকাল করঞ্জলের সঙ্গে আমার কথা হয়ে গেছে। করঞ্জল বলেছে সে আমার এখানে মাঝে মধ্যে ঘুরতে আসতে পারে, পাকাপাকি ভাবে থাকার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারে না। সঙ্গে এটাও বলেছে যে, সে কোনওদিন ভাগও নিতে আসবে না। নির্মলা যাকে ইচ্ছে আশ্রমটা দিতে পারে।'' কিছুক্ষণ থেমে যেন খানিকটা দম নিয়ে নির্মলা বললেন ''আমি ঠিক করেছি ইন্দ্রানীকে দত্তক নেব আর উইল করে এখানকার বাড়িঘর, কিছু টাকা ইন্দ্রানীর নামে লিখেদেব। শেষ জীবনটা কেয়ার অফ এই ইন্দ্রানীর ভরসায় কাটিয়ে দেব। ঠাকুরঝি সিদ্ধান্তটা ঠিক নিয়েছি তো?'' কালোন আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারলো না। নির্মলাকে জড়িয়ে ধরে অঝোরে কাঁদতে লাগলো। নির্মলা বলে চললেন, ''আমি চেয়েছিলাম তোমার দাদাকে সম্পূর্ণরূপে পেতে। তোমার দাদা সংসারের প্রতি কর্তব্যপরায়ণও ছিলেন। তবুও কেন জানিনা আমার মনে হতো ইন্দুর মনের কোণে অন্য কারওর উপস্থিতি। পাশে থেকেও মনে হতো যেন অনেক দূরে আছে। আজ উঠি ঠাকুরঝি ,'' বলে উঠে পড়লেন নির্মলা। কালোন ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল। বলল, ''আবার এসো।'' নির্মলা বললেন, ''বাড়ি ফিরেই উকিলদাদার সঙ্গে দেখা করে ইন্দ্রানীর নামে দানপত্র করতে হবে। আশ্রমের সবকিছু বুঝিয়ে দিতে হবে ওকে। তবেই আমার শান্তি। ইন্দুর সঙ্গে ওপারে দেখা হলে অন্তত বলতে পারব, যে কাজ তুমি করতে পারনি, তার খানিকটা করে এলাম। চললাম ঠাকুরঝি ভাল থেক,'' কালোন বলল ''চললাম বলতে নেই, বলো আসি।''

শিশুমনের আয়নায় -

স্কেচ ঃ তরুণিমা ভৌমিক, ক্লাস - দ্বিতীয় শ্রেণী

কুমারী পুজো

কাজল সেন

শরৎকালে শ্রীরামচন্দ্র দেবী দুর্গাকে নবমীর দিন একশ আটটি নীলপদ্ম অঞ্জলি দিয়ে দুর্গাপুজোর সূচনা করেন। এখনও সেই রীতি চলে আসছে সেই সঙ্গে চলে আসছে নবমীর দিন কুমারী পুজো।

শ্রী শ্রী চন্ডীতে বলা আছে স্ত্রীজাতি মাত্রই ব্রহ্মময়ী মহামায়া, জগজ্জননীর এক একটি রূপ। নারীই যেন জীবন্ত তাঁর প্রতিমা অর্থাৎ প্রতীক। প্রতিটি নারী ভগবতীর এক একটি রূপ হলেও শুদ্ধমত্তা কুমারীর মধ্যে দেবীর ভগবৎসত্তা বিশেষভাবে প্রকাশত। এজন্য দুর্গাপূজার সময় কুমারী পূজা হয়ে থাকে।

আমরা সাধারণত অবিবাহিত যে কোন কন্যাকেই কুমারী বলে থাকি। তার মানে এই নয় যে অতিবয়ঃবৃদ্ধা অবিবাহিত নারীকে কুমারী বলা হবে। কুমারী পূজায় কুমারী হবে অনাঘ্রাত কুসুম। যতদিন না ফুল ফোটে, যতদিন পর্য্যন্ত ঋতুমতী না হয় ততদিন সে কুমারী এবং তা যেন অনাঘ্রাত কুসুমের মতোই পবিত্র। সেই হবে কুমারী পূজার যোগ্য কন্যা।

তন্ত্রমতে ষোলবছর পর্য্যন্ত অবিবাহিত প্রতিটি কন্যার মধ্যে দেবীর এক একটি রূপ পরিলক্ষিত হয়। যথা এক বছরের কুমারীকে দেবীর সন্ধ্যারূপে পূজা করা যেতে পারে। দু'বছরের কন্যার মধ্যে দেবীর সরস্বতী মূর্তিতে পূজা করা হয়। তিন বছরের কন্যার মধ্যে দেবীর ত্রিধারামূর্ত্তি-কে আরাধনা করা হয়। চার বছরের কন্যার মধ্যে দেবীর কালিকারূপ প্রকাশিত। পাঁচ বছরের কন্যাকে দেবীর সুভগা রূপে পূজা করা হয়। ছ'বছরের কুমারীকে দেবী উমা রূপে অর্চনা করা হয়। সাত বছরের কন্যাকে পূজা করা হয় দেবী মালিনী রূপে। আট বছরের কুমারীকে দেবী কুব্জিকা নামে অভিহিত করা হয়। নয় বছরের কন্যাকে দেবী সন্দর্ভা রূপে পূজা করা হয়। দশ বছরের কন্যাকে দেবী অপরাজিতা রূপে ও নামে পূজা করা হয়। এগারো বছরের কন্যার মধ্যে দেখা হয় দেবীর রুদ্রাণী রূপ। বারো বছরের কন্যার মধ্যে দেবীর ভৈরবী রূপের প্রকাশ, তেরো বছরের কুমারীকে দেবী মহালক্ষ্মী রূপে পূজা করা হয়। চোদ্দ বছরের কন্যাকে পীঠনায়িকা রূপে আরাধনা করা যায়। পনেরা বছরের কুমারীকে দেবীর ক্ষেত্রজ্ঞা রূপে পূজা করা হয়। আর ষোল বছরের কন্যা কুমারীকে পূজা করা হবে অম্বিকা রূপে। এরমধ্যে ছয়, সাত ও আট বছরের কন্যার পূজা ই প্রশস্ত।

শাস্ত্রে ষোল বছরের কন্যাকে কুমারী পূজার নির্দেশ থাকলেও বলা হচ্ছে যে কৃষ্ণা নবমী থেকে শুক্লা নবমী পর্যন্ত ১৬ দিনে ষোল রূপে কুমারীকে পূজা করা যেতে পারে যে ষোলটি রূপ উপরে উল্লিখিত হয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, প্রতিটি স্ত্রীলোকই ভগবতীর এক একটি রূপ। কুমারীর মধ্যে ভগবতীর প্রকাশ অধিক। কুমারীকে তিনি শুদ্ধাত্মা বলে শ্রদ্ধা করতেন। স্ত্রী সারদাদেবীকে ষোড়শী রূপে পূজা করতেন। এই শক্তিরূপিণী যখন শ্রীরামকৃষ্ণ সকাশে আসতেন তখন শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রদ্ধাভরে উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান জানাতেন। সারদাদেবী ঠাকুরকে প্রণাম করলে — 'জয় মা ব্রহ্মময়ী' বলে করজোড়ে ঠাকুর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতেন মহাশক্তি সারদাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, মাকে কুমারীর ভিতর দেখতে পাই বলে কুমারী পূজা করি। মাকে দেখতে হলে দিব্যচক্ষু চাই। মন শুদ্ধ হলেই সেই চক্ষু হয় যার নাম দিব্যচক্ষু।

আলোয় ভালোয় ভরাও ভুবন

ভবানীপ্রসাদ মজুমদার

দুর্গতি দূর করো মা সবার, মা দুর্গতিহারিণী।
সবার বিপদ দূর ক'রে দাও দুর্গা বিপদতারিণী।
হাসি ফোটাও সবার মুখে
খুশি জোটাও দুঃখী-বুকে
খড়্গ হাতেই স্বর্গ থেকে এসো মা ত্রিশূলধারিণী
শান্তির সুর দাও ছড়িয়েই ভুবনে শান্তিবারিণী।

আজও কেন কাঁদছে মানুষ বলো না বিন্ধ্যবাসিনী
দু'বেলা দু'মুঠো পায় না খেতে কেন মা মধুরহাসিনী?
বিশ্ব জুড়ে নিঃস্ব ছবি
দৃশ্য সবই, তাইতো কবি
জানায়, কষ্ট শেষ ক'রে দাও শিবানী - কষ্টনাশিনী
হাসুক তারাও, বলছে যারা, মাগো বহুদিন হাসিনি।

আলোয় ভালোয় ভরাও ভুবন মা ভগবতী-ভাস্বতী
ভোলাও দুঃখ, দোলাও রুক্ষ-হৃদয় সতী শাশ্বতী।
সবার বুকে শিউলি ফুটুক
সুবাস ছুটুক, সূর্য উঠুক
আলতো - আলোর আল্পনাতে জাগো মাগো মহাশক্তি
শুভদিনের স্বপ্ন দেখাও, হৃদয়ে দাও মা ভক্তি।

সবাই হাসুক, ভালোবাসুক কপর্দিনী - কাত্যায়নী
পৃথিবীতে স্বর্গ নামুক সনাতনী - ত্রিনয়নী।
সুখে ভাসাও আদ্যা - অম্বা
জাগাও জগত মা জগদম্বা
দুঃখের দিন শেষ ক'রে দাও দক্ষকন্যা - দাক্ষায়নী
বিশ্বমোহিনী দনুজদলনী, জয় মা জগজ্জননী।

মরণোত্তর চক্ষু ও দেহদান সংগ্রহ কেন্দ্র

পরিচালনায় ঃ অমরাগড়ী যুব সংঘ

অমরাগড়ী, জয়পুর, হাওড়া।

আমরা শুধু অঙ্গীকার চাই না
মরণোত্তর চক্ষু ও দেহ চাই।

০৩২১৪-২৩৪-১৬৫, ৯৪৩৪৫৬৪৯৪৯